মানবাধিকার বার্তা

thro.org.in

আগস্ট, ২০২৬ চতুর্থ সংখ্যা

ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন

-:সম্পাদকীয়:-

আগামী দিনে রাজপথই হোক দেশবাসীর ঠিকানা

২৫শে জুলাই, ২০২৬। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি অন্যতম উজ্জ্বল দিন। ছাত্র যুবদের ঐতিহাসিক আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ঐদিন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ২০১৪-র পর আর.এস.এস-বিজেপি এত বড় ধাক্কার সম্মুখীন হয়নি। ২০ জুলাই ছাত্র-যুবদের সংসদ অভিযান সমস্ত দমন পীড়ন ও সমস্ত রকম বর্বরতা কে অতিক্রম করে শান্তিপূর্ণ গণ আন্দোলনের নুতন সাক্ষর রচনা করেছিল নয়া দিল্লি জুড়ে।

সমস্ত রকম বাধা-বিপত্তি, হুমকি, অপপ্রচার ও সন্ত্রাস অগ্রাহ্য করে কয়েক লক্ষ ছাত্র যুবক নয়াদিল্লির রাজপথে হেঁটেছিল সংসদ অভিযানে অংশ নিতে। তাদেরকে আটকানোর জন্য কোন চেষ্টারই কসুর বাকি রাখেনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে ও নির্দেশে দিল্লি পুলিশ ও প্রশাসন। দিল্লির রাজপথ রক্তাক্ত হয়েছে। ছাত্র যুবদের পিঠে, বুকে পেলেট বন্দুক এঁকেছে একের পর এক ক্ষতের মানচিত্র। ছাত্রীদের শ্রীলতাহানি করা হয়েছে। পুলিশের সাথে

সাদা পোশাকে গুন্ডাদের মোতায়েন করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরও ছাত্র-যুবদের জোয়ার কে আটকানো যায়নি।

৫ ই জুলাই থেকে দিল্লির যন্তর মন্তরে সোনাম ওয়াংচুকের অনশন, নেহা বোরা সহ একদল ছাত্র-ছাত্রীদের অনশন, যন্তর মন্তরে হাজার হাজার ছাত্র যুবদের অবস্থান জানান দিচ্ছিল, দেশের ছাত্র যুবরা মুক্তি চাইছে কর্মহীনতা ও অশিক্ষার অন্ধকার থেকে, নৈরাজ্যের বর্তমান থেকে। ছাত্র যুবরা নিজেদের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে এক ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন দেখছে এবং যারা দেশের ছাত্র যুবদের ভবিষ্যৎকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করছে, তাদের বিরুদ্ধে ছাত্র-যুবরা সমস্ত বিভাজন-বিদ্বেষ ও বিভ্রান্তির জাল ছিন্ন ভিন্ন করে ঐক্য ও সংগ্রামের পতাকা নিয়ে দৃঢ় চিত্তে এগিয়ে এসেছে।

ওয়াংচুককে অনশন স্থল থেকে অপহরণ করে তুলে নেওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান ক্রোধের আগুন আরো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে দেশজুড়ে। ছাত্র যুবদের আন্দোলনকে বিজেপি-আর.এস.এস. "দেশদ্রোহী" তকমা পরিয়ে উপেক্ষা করছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের হিসেব ছিল, উপেক্ষা করে এবং দমন পীড়ণের মাধ্যমে এই আন্দোলনকে শেষ করে দেওয়া যাবে। কিন্তু তাদের হিসাবে ভুল ছিল। গত ১৪ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ, ছাত্র-যুবদের যন্ত্রণা বহিঃপ্রকাশের সঠিক পথ ও সময় খুঁজছিল।

ককরোচ জনতা পার্টির ডাকে নীটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায় নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিকে সামনে রেখে যন্তর মন্তরে ছাত্র যুবদের সাহসী আন্দোলন সারাদেশে সাহসের এক নুতন বার্তা ছড়িয়ে দেয়। ভয়ের কুয়াশার বিরুদ্ধে ছাত্র যুবদের আমরণ অনশন, দৃঢ়চেতা বিরোধিতা এক নুতন সাহসের ঢেউ সৃষ্টি করে।

প্রথম দু সপ্তাহ এই আন্দোলনকে বৃহৎ মিডিয়া উপেক্ষা করে। ছাত্র যুবরা গোদী মিডিয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল না। ছাত্র-যুবদের গণআন্দোলন দেখিয়ে দিল আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিকল্প মাধ্যম আন্দোলনের ময়দানেই তৈরি হয়। সামাজিক মাধ্যমের উদ্ভাবনী ব্যবহার,

প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা সারাদেশে আন্দোলনের বার্তাকে, সাহসের প্রতিস্পর্ধী উচ্চারণকে ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে।

ভয় যেমন সংক্রামক, সাহসও তেমনি সংক্রামক। যখন কেন্দ্রীয় সরকার বুঝলো, ভয় দেখিয়ে আন্দোলনকে দমন করা যাবে না, মধ্যরাত্রিতে প্রধানমন্ত্রীর নাটকীয় ভিডিও প্রচারে চিড়ে ভিজছে না, আন্দোলনকারীদের "দেশদ্রোহী" "আরবান নকশাল" "পাকিস্তানি" "চীনের দালাল" ইত্যাদি সম্বোধন বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে এবং ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকবে না, ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি উঠে আসছে এবং ১২ বছরের মধ্যে এই প্রথমবারের মত বিজেপি-আরএসএসের শাসনের নৈতিক বৈধতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে, তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে বলি দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা খোলা ছিল না কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে।

একটা প্রচন্ড শক্তিশালী ফ্যাসিবাদী শক্তি যখন জনগণের চাপে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই বিজয় উৎসব উদযাপিত হয় সারা দেশে। স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ যে পরীক্ষার উপর নির্ভরশীল সেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে দপ্তরের মন্ত্রীর পদত্যাগ করাটাই স্বাভাবিক নিয়ম। এটাই নৈতিকতা এবং জবাবদিহিতা। ভারতবর্ষে এখন স্বাভাবিক গণতন্ত্র ছুটিতে। এখন দেশে চলছে উগ্র সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট শক্তির শাসন। তাই শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের জন্য ২০ দিন একটানা আন্দোলন করতে হয়, অনশনে জীবন বিপন্ন করতে হয় এবং দমন পীড়ন সহ্য করতে হয়।

ছাত্র-যুবদের আন্দোলনের আশুলক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। কিন্তু মূল লক্ষ্য এখনো অনেক দূরে। পরীক্ষা ব্যবস্থায় আমুল সংস্কার, নীট বাতিলের প্রশ্ন, নয়া শিক্ষা নীতি বাতিল, শিক্ষাকে সাম্প্রদায়িক গৈরীকরণের থেকে মুক্ত করা, শিক্ষাকে কর্পোরেট বাণিজ্যের থাবা থেকে উদ্ধার করা । এদেশের কোটি কোটি যুবকের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, ইত্যাদি বিষয়গুলো কিন্তু

অমীমাংসিত রয়ে গেছে। এই প্রশ্নে ছাত্র যুব আন্দোলনকে আগামী দিনে আরো অনেক পথ হাঁটতে হবে।

২৫শে জুলাই-এর জয় আগামী দিনের লড়াইকে সংহত করবে, শক্তি যোগাবে, সাহসী করে তুলবে এদেশের আপামর জনসাধারণকে।

ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে বিজেপি-আরএসএসের প্রচার যন্ত্র দ্বারা সৃষ্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অতি মানবীয় ভাবমূর্তি প্রায় ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে,একই সাথে ফ্যাসিবাদী শাসনকে আপাতদৃষ্টিতে অমিত পরাক্রমশালী অপরাজেয় মনে হলেও শেষ বিচারে যে ফ্যাসিবাদী শাসন খড়কুটোর উপর দাঁড়িয়ে আছে, এই সত্যটা উপলব্ধি করতে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দেশবাসীকে বিরাটভাবে সাহায্য করবে। এই আন্দোলন অত্যন্ত ইতিবাচক। পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ছাত্রছাত্রীরা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান ঐতিহ্য ও পরম্পরার সাথে সাজুজ্য রেখে অনশন করেছেন, শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ করেছেন, হাসিমুখে কন্টক আকীর্ণ ব্যায়নটের আঘাত সহ্য করেছেন, প্যালেট বন্দুকের নিশানার সামনে পিছু হটেননি। তরুণ ছাত্রছাত্রীরা যে অদম্য মানসিকতা ও সংকল্পবোধের পরিচয় দিলেন, তাতে স্পষ্ট তারা প্রকৃতই ভগৎ সিং, যতীন দাস, প্রফুল্ল চাকী, মাস্টারদা সূর্য সেন, বিনয় বাদল দীনেশের সার্থক উত্তরসূরী। আমাদের দেশের ছাত্র যুবদের রক্তে ও জিনে রয়েছে মৃত্যুর সাথে লড়াই করে অনশনের ডিএনএ। তাই ছাত্র যুবরা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা কষে অনশন চালিয়ে যেতে পারেন দিনের পর দিন। আরএসএস বিজেপির পক্ষে অনশনের মাহাত্ম্য বোঝার কোনো সুযোগ নেই, কারণ তাদের পূর্বসুরীরা কোনদিন অনশনে অংশগ্রহণ করেনি। তাদের পূর্বসুরীদের পিঠে কোনদিন বৃটিশের লাঠি পড়েনি। সেলুলার জেলে যাবজ্জীবন বন্দীদের উপর অসহনীয় অত্যাচার তাদের কাউকে সইতে হয়নি। কারণটা স্বাভাবিক। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও হিন্দু মহাসভা কোনদিন স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি। স্বাধীনতা আন্দোলনের

সময় তাদের ভূমিকাটা ছিল প্রকৃত দেশদ্রোহীর ভূমিকা, বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা।

ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ পত্র থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এই আন্দোলন থেকে কোনো শিক্ষা আরএসএস-বিজেপি গ্রহণ করেনি। পদত্যাগ পত্রে জেন-জি ছাত্র আন্দোলনকে কলঙ্কিত করার অপপ্রয়াস, এই আন্দোলনের পেছনে তথাকথিত বিদেশিদের মদত খোঁজার চেষ্টা করা এবং ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ পত্রে বলা, তিনি নাকি দেশবিরোধী শক্তি যাতে আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি থেকে ফায়দা লোটার চেষ্টা না করতে পারে, তার জন্যই পদত্যাগ করেছেন। এটা শুধু ধর্মেন্দ্র প্রধানের মনের কথা নয়, এটা আর.এস.এস-বিজেপির মনোভাবের প্রকাশ। তারা এই আন্দোলন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনি। তাদের কাছে নৈতিকতার কোন স্থান নেই। তাদের অভিধানে জবাবদিহিতা নেই। তাই ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ পত্রে আন্দোলনকারীদেরই দায়ী করেছেন এবং নৈতিক দায়বদ্ধতার কোন চিহ্ন তার পদত্যাগ পত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর উপর দমন পীড়নের জন্য কোন দুঃখ অনুশোচনা বা অনুতাপ নেই অর্থাৎ আর.এস.এস-বিজেপি আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিতে প্রস্তুত নয়। তাদের সংশোধনের কোন প্রশ্নই নেই। এটা সাময়িক পশ্চাদপসরণ। সুযোগ বুঝে ও পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে আহত বাঘ দ্বিগুণ আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সেই কারণেই শুধু মাত্র বিজয় উৎসব ও উচ্ছ্বাসে থেমে থাকলে চলবে না। এই আন্দোলনের জয়কে ব্যাপক করতে হবে।

ভূমি অধিগ্রহণ আইনের সংশোধন প্রশ্নে ক্ষমতায় আসার কয়েক বছরের মধ্যে বিজেপি আরএসএসকে পিছু হটতে হয়েছিল। ২০২০-২১ কৃষক আন্দোলনের সামনে চাপে পরে তিনটি কৃষক আইন বাতিল করতে হয়েছিল । কোভিডের পূর্বে নাগরিকত্ব সংশোধন আইন নিয়ে জনজমায়েত শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নুতন ক্ষেত্র তৈরি করছিল । ২০২৬-র ছাত্র যুব আন্দোলন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আন্দোলন। সর্বপ্রথম সমাজের সর্বস্তরের সর্ববর্গের ছাত্র-ছাত্রী ও

সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করে। এক ব্যাপক সাড়া গড়ে ওঠে। আন্দোলনের ময়দানে আরএসএস / বিজেপির সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িক আধিপত্ববাদের বিরুদ্ধে, মুসলিম বিদ্বেষী ঘৃণ্য রাজনীতির বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের ব্যাপক ঐক্য দেখিয়ে দিয়েছে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে কোনঠাসা করা সম্ভব। রুটি, রোজি, কাপড়া ও মাকানের প্রশ্নে বিভিন্ন অংশের মানুষকে আন্দোলন মুখী করা ফ্যাসিবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রকৃত প্রতিষেধক।

এই আন্দোলনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। প্রয়োজন এই আন্দোলনের জয় কে সঠিকভাবে সংহত করে আগামী কর্মসূচি তৈরি করা। এর সাথে কৃষক-শ্রমিকদের আন্দোলন, আদিবাসী প্রান্তিক অংশের মানুষের জীবন জীবিকার লড়াই, সংখ্যালঘুদের অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে নুতন নুতন জনজমায়েতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে, ভয় ভাঙছে। ফ্যাসিস্ট শক্তি যখন সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর দখল নিয়েছে, সংসদে যখন আলোচনার সুযোগ প্রায় নেই, যখন বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা গভীর প্রশ্নের মুখে, সার্বজনীন ভোটাধিকার যখন নির্বাচন কমিশনার মাধ্যমে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, নুতন স্বাভাবিকতায় কোটি কোটি মানুষকে ভোটাধিকারকে থেকে বঞ্চিত করে সুষ্ঠু নির্বাচনের ঢাক পেটানো হচ্ছে, যখন বুলডোজার রাজ ও এনকাউন্টার উৎসব চলছে, বিচার বিভাগ যখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চোখ বুজে আছে, যখন গণমাধ্যম সরকারকে প্রশ্ন না করে ক্ষমতার কোলে বসে লজেন্স খাচ্ছে, তখন রাজপথ একমাত্র পথ খোলা আছে দেশবাসীর জন্য। যন্তর মন্তর আন্দোলন। সেটাই প্রমাণ করল। আগামী দিনে দেশবাসীকে রাজপথ জুড়েই থাকতে হবে। গণতন্ত্রকে ফ্যাসিবাদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য, ছাত্র-যুব সহ দেশের মানুষের জীবন-জীবিকার অধিকারকে, বাঁচার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে।

সূচিপত্র

১. রসুইয়ে ক্যালরির আনাগোনা - গৌতম রায় বর্মন /9

২. দারিদ্র্য, ক্ষমতা ও প্রকাশ্য সহিংসতা: সমসাময়িক সমাজে ন্যায়বিচারের পুনর্ভাবনা - প্রশান্ত চক্রবর্তী / 12

৩. ভারতের 'ককরোচ আন্দোলন' কেন সফল হলো ? ....ইশতিয়াক মোহাম্মদ ফখরুদ্দীন/ 17

৪. "এ আই এর উত্তর ভূল এবং বিভ্রান্তিপূর্ন হতে পারে" - সুচিত্রা কার্তিকেয়ন/ 22

৫. মানবাধিকার কর্মীর জীবন নিয়ে ছবি : ৮০ ও ৯০ দশকের পাঞ্জাব : অতীতকে ফিরে দেখা কেন জরুরী - পুরুষোত্তম রায় বর্মন/ 25

৬. দুটি আদালতের দুটি রায় : কিছু কথা - অলকানন্দা চৌধুরী/ 36

৭. ভয়ের মধ্যেও যারা সাহসী ছিল – তীর্থ রাজ ধর/ 40

৮. স্বাস্থ্য দপ্তরের স্বাস্থ্য কাঠামো অস্বাস্থ্যকর - রতন দেবনাথ/ 46

৯. ৩১ শে জুলাই, অনিয়মিত কর্মীদের কালো দিবস পালন / 49

১০. মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের চিতা আন্দোলন -মিহিরলাল রায়/ 51

১১. বিচারাধীন বন্দীর মৃত্যু : বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানালো টি এইচ আর ও/ 55

রসুইয়ে ক্যালরির আনাগোনা

- গৌতম রায় বর্মন

আজকাল আকছার "ক্যালরি" শব্দটির ব্যবহার হচ্ছে । খাদ্য, স্বাস্থ্য ও দেহের ওজন সম্পর্কিত আলাপচারিতায় এই শব্দটির বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। ডায়াবেটিস রোগী সহ বিভিন্ন অসুখ-বিসুখে যারা ভুগছেন তারা ক্যালরি নিয়ে কমবেশি ওয়াকিবহল। স্বাস্থ্য সচেতন মানুষরাও খাদ্যের ক্যালরি নিয়ে খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছে । ইদানিংকালে প্যাকেট জাত বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের গায়ে ক্যালরির হিসাব দেওয়া থাকে। এই একমাত্র এককটি এখন আমাদের খাবার দাবারের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। বিভিন্ন রকমের মানুষের প্রত্যহ নির্দিষ্ট পরিমাণ বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে হয়। একে পথ্য বা ডায়েট বলে। এখন ডায়েটে ক্যালরির উপস্থিতির প্রতি নজর রাখা হচ্ছে। ক্যালোরি ইন ও ক্যালরি আউটের সামঞ্জস্য আনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।এখন প্রশ্ন হলো, এই গুরুত্বপূর্ণ শব্দ "ক্যালরি" আসলে কি এবং কিভাবে এর উৎপত্তি হলো?

উৎপত্তিটা কিন্তু রান্না ঘরে হয়নি । হয়েছে ফরাসি দেশের রসায়নাগারে। ১৭৮০ সালে । আতোয়ান-লর দ্য লাভোয়াসিয়ে ছিলেন একজন বিখ্যাত ফরাসি বিজ্ঞানী । তাঁকে আধুনিক রসায়নের জনক বলা হয় । তিনি ভরের সংরক্ষণ সূত্র আবিষ্কার করেন । এছাড়া দহনে অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন । জীববিজ্ঞানেও তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে । লাভোয়াসিয়ে এক আমূল পরিবর্তনকারী ধারণা উপস্থাপন করেন যে, শ্বসন হলো এক ধরনের দহন (Combustion)। মোমবাতি বা প্রদীপের দহনের ন্যায় । তার এই বক্তব্যের বৈজ্ঞানিক সত্যতা যাচাই করতে আইস ক্যালোরিমিটার বা বরফ ক্যালোরিমিটার নামক এক যন্ত্রের আবিষ্কার করেন । এক্ষেত্রে তার সহযোগী ছিলেন বিজ্ঞানী পিয়ারী-সিমন ল্যাপ্লেস । এই যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তুর হিট ক্যাপাসিটি

পরিমাপ করা হয় অথবা কোন শারীরিক বা রাসায়নিক পরিবর্তনে যে তাপের ব্যবহার হয় তা পরিমাপ করা হয়। যন্ত্রের সাহায্যে বরফের গলনের সুপ্ত তাপ বা লীন তাপ নির্ধারণ করা হয়। যখন কোন গরম বস্তু বা রাসায়নিক বিক্রিয়াতে তাপ নির্গত হয় সেই তাপের প্রভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ বরফ গলে জলে পরিণত হয়। বরফ গলে যাওয়ার ফলে যে আয়তনের পরিবর্তন হয় তা পরিমাপ করা হয় অথবা গলে যাওয়া জলের ভর মেপে সিস্টেমে শুষিত বা নির্গত তাপের পরিমাপ করা হয়। ১৭৮০ সালে এই যন্ত্রের আবিষ্কার করেন এই দুই বিজ্ঞানী । এভাবেই জীবদেহে উৎপন্ন তাপ ও জীবনে প্রয়োজনীয় শক্তির যোগসূত্র স্থাপন করেন লাভোয়াসিয়ে । একসাথে সংযোগ সাধিত হয় পদার্থবিজ্ঞানের তাপের সাথে জীবদেহে ব্যবহৃত শক্তির । আর এই এনার্জি পরিমাপ করার জন্য "Calorie"(ক্যালরি) নামক এককের ব্যবহার শুরু হয়। ল্যাটিন ভাষায় ক্যালোরি হল হিট বা তাপ। এরপর থেকে ডায়েট ক্যালোরি যাত্রা শুরু হয় । ১৮৪০ সালে জার্মান বিজ্ঞানী জাস্টস ফন লিবিয়ান ও তার ছাত্ররা বিভিন্ন খাদ্য থেকে মানবদেহে যে শক্তি নির্গত হয় তা পরিমাপ করেন। পরবর্তী সময়ে লিবিয়নের ছাত্র ম্যাক্স রুবনেট কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট খাবারের তাপন মূল্য (Calorific Value)পরিমাপ করেন । এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে প্রত্যেকবার মানুষ যে খাবার খায় তার থেকে প্রাপ্ত ক্যালোরি হিসেব কষা যায়। যেমন একটি আপেলে প্রায় ৯৫ ক্যালরি শক্তির উৎপন্ন হয়। এক গ্রাম ফ্যাটের জারনে ৯.৩ কিলো ক্যালরি তাপ উৎপন্ন হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ক্যালোরি আসলে কিলো ক্যালোরি হিসেবে বর্ণিত হয় যা ১০০০ ছোট ক্যালোরিকে প্রকাশ করে। এ ধারণার প্রবর্তক ছিলেন বিজ্ঞানী এটওয়াটার।

আমেরিকান রসায়ন বিজ্ঞানী উইলবার অলিন এটওয়াটারকে (১৮৪৪ - ১৯০৭) আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। ১৮৯০ সালে তিনি একটি সরকারি বুলেটিনে ১০০ টি খাবারের শক্তি মূল্য (energy value) বর্ণনা করে তা জনসাধারণের সামনে আনেন । বর্তমানে এই গণনার ভিত্তিতে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের ক্যালরি ভ্যালু নির্ধারিত হয়। তাই এখন আমরা কি খাব কতটা খাব

তার হিসেব কষে পথ্য ঠিক করতে পারি। সুস্বাস্থ্যের জন্য সঠিক খাবার খাওয়া জরুরী। দেহের এনার্জির চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে খাদ্য গ্রহণ করতে হলে সবাইকে ক্যালরি সম্পর্কে কমবেশি ওয়াকিবহল হতে হবে। সুস্থ জীবন যাপনের জন্য এটাই হবে মূল চাবিকাঠি। একইসাথে এই কথাটাও মনে রাখতে হবে যে, মানবদেহ সরল চুল্লি নয় যাতে যতটা জ্বালানি দেওয়া হবে ততটা শক্তি নির্গত হবে। খাদ্যের দহনে কতটা শক্তি দেহ আত্মস্থ করবে তা অনেকটা নির্ভর করবে দেহত জিন, গাঁট ব্যাকটেরিয়া এবং গৃহীত খাদ্যের রন্ধন পদ্ধতির উপর। সমপরিমাণ ক্যালরিযুক্ত সকল খাদ্যই দেহের পক্ষে সমানভাবে উপযোগী নাও হতে পারে। যেমন কাজুবাদামের 200 ক্যালোরির সাথে ঠান্ডা পানি এর 200 ক্যালোরি অনেক পার্থক্য রয়েছে। তাই কেবল ক্যালরি মেনে খাবার খেলেই হবে না খাবারের গুণমান বিচার করে আহার করতে হবে।

দারিদ্র্য, ক্ষমতা ও প্রকাশ্য সহিংসতা: সমসাময়িক সমাজে ন্যায়বিচারের পুনর্ভাবনা

- প্রশান্ত চক্রবর্তী

সমসাময়িক সমাজে অসহিষ্ণুতার দ্রুত বিস্তার আজ আর বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়; বরং এটি আমাদের সামাজিক বাস্তবতার এক উদ্বেগজনক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক—প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর প্রভাব ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ক্ষমতাবান থেকে ক্ষমতাহীন, বিত্তবান থেকে সুবিধাবঞ্চিত—অসহিষ্ণুতার এই প্রবণতা সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তরেই ছড়িয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর মানুষের মধ্যে দেশি মদ্যপান, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সামান্য চুরি কিংবা দৈনন্দিন বিবাদকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা প্রায়ই সামনে আসে। আপাতদৃষ্টিতে এগুলো বিচ্ছিন্ন বা তুচ্ছ ঘটনা বলে মনে হলেও, বাস্তবে এগুলো গভীর অর্থনৈতিক বৈষম্য, দীর্ঘস্থায়ী অনিশ্চয়তা এবং জমে থাকা সামাজিক হতাশার বহিঃপ্রকাশ। সমাজের নিচের স্তরে সংঘটিত এই সংঘর্ষগুলো অনেক সময় প্রকৃত সমস্যার কারণ নয়; বরং বৃহত্তর কাঠামোগত বৈষম্যের লক্ষণমাত্র। অন্যদিকে, সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত অংশের একটি বড় অংশ সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্য সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যাটি খুঁজে পায় দরিদ্র মানুষের মধ্যে। যেন দারিদ্র্য নিজেই একটি অপরাধ, আর দরিদ্র মানুষ সমাজের প্রতিটি অস্বস্তিকর ঘটনার স্থায়ী আসামি। ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অসম বণ্টন এমন এক পরিবেশ তৈরি করে, যেখানে সমাজের প্রান্তিক মানুষকে অপমান করা, শাস্তি দেওয়া কিংবা জনসমক্ষে হেয় করা অনেকের কাছে নৈতিক কর্তব্য বলে মনে হয়। ক্ষমতার এই বৈষম্য কেবল সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; এটি মানুষের মর্যাদা, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগকেও অসম করে তোলে। আইন সবার জন্য সমান—এই নীতিটি তখন কাগজে অটুট

থাকলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ শ্রেণি, প্রভাব এবং পরিচয়ের উপর নির্ভর করতে শুরু করে।

সংবিধান ও আইন সকল নাগরিকের সমান অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। কিন্তু বাস্তব জীবনে এই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মানুষের অভিজ্ঞতার ব্যবধান ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিচারব্যবস্থা প্রায়ই দীর্ঘ, ব্যয়বহুল এবং পদ্ধতিগতভাবে জটিল। যেসব পরিবারের প্রতিদিনের সবচেয়ে বড় সংগ্রাম দুবেলা খাবারের ব্যবস্থা করা, তাদের কাছে আদালতের লড়াই প্রায় বিলাসিতার সমান। ন্যায়বিচার পাওয়ার আগেই অনেকের সঞ্চয় শেষ হয়ে যায়, কর্মঘণ্টা নষ্ট হয় এবং মানসিক শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়। ফলে বহু মানুষ অন্যায় মেনে নেওয়াকেই বাস্তবসম্মত সমাধান বলে ধরে নেন। আইনের চোখে তাঁরা সমান নাগরিক, কিন্তু বাস্তবে তাঁদের নীরবতাই হয়ে ওঠে সবচেয়ে সস্তা এবং সবচেয়ে সহজলভ্য বিচার।

তবে নির্বাচনের সময় দৃশ্যপট খানিকটা বদলে যায়। তখন এই দরিদ্র মানুষেরাই হঠাৎ করে গণতন্ত্রের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদে পরিণত হন। তাঁদের দরজায় পৌঁছে যায় উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি, কল্যাণের অঙ্গীকার এবং সমতার ভাষণ। ভোটের দিন পর্যন্ত তাঁদের গুরুত্ব অটুট থাকে। ভোট শেষ হলে সেই গুরুত্বও যেন ব্যালট বাক্সের সঙ্গে সযত্নে সিলমোহরবন্দি হয়ে যায়। গণতন্ত্রের এই অদ্ভুত নাট্যমঞ্চে দরিদ্র মানুষের ভূমিকা অনেকটা অপরিহার্য পার্শ্বচরিত্রের মতো—তাঁদের উপস্থিতি ছাড়া নাটক সম্পূর্ণ হয় না, কিন্তু আলো সবসময় পড়ে অন্য কারও উপর।

বঞ্চনার বাস্তবতা অবশ্য নির্বাচনী বক্তৃতার চেয়ে অনেক বেশি নির্মম। দেশের নানা প্রান্তে এখনও অসংখ্য পরিবার ফুটপাতে কিংবা অনানুষ্ঠানিক বসতিতে বসবাস করে। অনিয়মিত মজুরির উপর নির্ভর করে তাদের সংসার চলে, অথচ সেই আয় পরিবারের সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের নিশ্চয়তাও দিতে পারে না। দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করেও তারা দারিদ্র্যের বৃত্ত ভাঙতে পারে না। গ্রীষ্মের প্রখর রোদে, বর্ষার কাদায় কিংবা শীতের কনকনে রাতে শ্রম বিক্রি করে সন্ধ্যায় তারা ফিরে আসে প্লাইউডের টুকরো, থার্মোকল, প্লাস্টিকের ত্রিপল কিংবা

উদ্ধার করা অন্যান্য উপকরণ দিয়ে বানানো অস্থায়ী আশ্রয়ে। শহরের উঁচু অট্টালিকা নির্মাণে যাঁদের শ্রম লাগে, সেই শ্রমিকদেরই অনেক সময় মাথা গোঁজার জন্য একটি নিরাপদ ছাদ থাকে না। উন্নয়নের পরিসংখ্যান তাই অনেক সময় বাস্তবের সঙ্গে অদ্‌ভুত বৈপরীত্য সৃষ্টি করে।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে আহমেদাবাদ সফরের সময় একটি বিষয় বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গুরুত্বপূর্ণ সড়কের ধারে অবস্থিত কয়েকটি বস্তি এলাকাকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর আগেও দেশের বিভিন্ন স্থানে উচ্চপর্যায়ের সফর কিংবা আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের আগে একই ধরনের উদ্যোগের কথা জানা গেছে। কোথাও অস্থায়ী পর্দা, কোথাও উচ্ছেদ অভিযান, কোথাও দ্রুত পুনর্বাসনের নামে স্থানান্তর। দারিদ্র্য দূর করার চেয়ে দারিদ্র্যকে চোখের আড়ালে সরিয়ে রাখার এই প্রশাসনিক দক্ষতা সত্যিই বিস্ময়কর। যেন রাষ্ট্রের কাছে সবচেয়ে জরুরি কাজটি হলো শহরের সৌন্দর্য রক্ষা করা, নাগরিকের জীবনমান নয়। দৃশ্যপট পাল্টে যায়, কিন্তু মানুষের জীবন একই থেকে যায়। সমস্যার সমাধান না করে সমস্যাকে অদৃশ্য করে দেওয়ার এই প্রবণতা আজ উন্নয়নের এক নীরব অলংকারে পরিণত হয়েছে।

নির্বাচনী রাজনীতিতে এই বৈপরীত্য আরও স্পষ্ট। রাজনৈতিক দলগুলো উন্নয়ন ও কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সমর্থন অর্জনের চেষ্টা করে। কিন্তু নির্বাচন শেষ হওয়ার পরও বহু মানুষ অপর্যাপ্ত আবাসন, দুর্বল স্বাস্থ্যব্যবস্থা, সীমিত শিক্ষার সুযোগ এবং অনিশ্চিত কর্মসংস্থানের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যান। সীমান্তবর্তী অঞ্চল ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী নাগরিকদের অবস্থাও প্রায় একই রকম। সাংবিধানিকভাবে তাঁরা সমান অধিকারপ্রাপ্ত হলেও, বাস্তবে সেই অধিকার প্রায়ই প্রশাসনিক ফাইলের বাইরে বেরোতে পারে না।

চরম দারিদ্র্য আমাদের সামনে জটিল নৈতিক ও আইনি প্রশ্নও তুলে ধরে। যখন কেউ বেঁচে থাকার তাগিদে খাদ্য বা অন্য কোনো মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিস চুরি করে, তখন আইন অবশ্যই সেই কাজকে অপরাধ হিসেবেই বিবেচনা

করবে। কিন্তু সেই আইন কোথাও কাউকে জনসমক্ষে অপমান, মারধর বা তাৎক্ষণিক শাস্তি দেওয়ার অনুমতি দেয় না। বিচারবহির্ভূত সহিংসতা কখনও ন্যায়বিচারের বিকল্প হতে পারে না। জনতার ক্রোধ যতই প্রবল হোক, তা আদালতের রায় হয়ে উঠতে পারে না। কারণ আইন যদি আবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তবে ন্যায়বিচার শেষ পর্যন্ত শক্তিশালীর হাতিয়ারেই পরিণত হয়।

সম্প্রতি, আমি আমার শহরে এমনই একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। শাসক দলে প্রভাবশালী পদে থাকা একজন বয়স্ক ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি একদল যুবককে একটি বাড়ি থেকে খাবার চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত এক কিশোরকে মারধর করতে উৎসাহিত করছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, এমন কঠোর শাস্তি ভবিষ্যতে অপরাধ কমাবে। একই সঙ্গে, ছেলেটির ধর্মীয় পরিচয় এবং কথিত 'অনুপ্রবেশকারী' পরিচয়কে সহিংসতার নৈতিক বৈধতা প্রতিষ্ঠার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। ঘটনাটি দেখিয়ে দেয়, কীভাবে অর্থনৈতিক অসহায়ত্ব, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং জনরোষ একত্রিত হয়ে বিচারবহির্ভূত সহিংসতাকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে। আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, সমাজে যাঁদের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও সামাজিক মর্যাদা মানুষকে সংযম, মানবিকতা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখানোর কথা, তাঁরাই যদি কখনও জনতাকে আইন নিজের হাতে তুলে নিতে উৎসাহিত করেন, তবে নৈতিক সংকট আরও গভীর হয়। শিক্ষিত মানুষের মুখে যখন যুক্তির পরিবর্তে প্রতিশোধের ভাষা শোনা যায়, তখন অশিক্ষার সংজ্ঞাটিও নতুন করে ভাবতে হয়।

এই বাস্তবতা আমাদের একটি অস্বস্তিকর প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়—দারিদ্র্য কি কেবল অর্থের অভাব, নাকি এমন এক সামাজিক অবস্থান, যেখানে মানুষের অধিকার, মর্যাদা এবং আইনি সুরক্ষাও ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়? একটি সভ্য সমাজের শক্তি নির্ধারিত হয় সে তার সবচেয়ে দুর্বল মানুষটির সঙ্গে কী আচরণ

করে, তার দ্বারা; সবচেয়ে শক্তিশালীর সঙ্গে কীভাবে আচরণ করে, তার দ্বারা নয়।

অতএব, সমসাময়িক সমাজে ন্যায়বিচারকে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু দারিদ্র্য, বঞ্চনা এবং সামাজিক বৈষম্যকে অপরাধের নৈতিক অজুহাতে পরিণত করা যায় না। একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সমাজের শক্তি জনতার ক্রোধে নয়, আইনের নিরপেক্ষতায়; প্রতিশোধে নয়, ন্যায়বিচারে; আর ক্ষমতার প্রদর্শনে নয়, প্রতিটি মানুষের মর্যাদাকে সমানভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার নৈতিক সাহসে।

ভারতের 'ককরোচ আন্দোলন' কেন সফল হলো ?

ইশতিয়াক মোহাম্মদ ফখরুদ্দীন

২০২৬ সালের ২৫ জুলাই ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করলেন। প্রায় অভিন্ন অভিযোগে এই একই মন্ত্রী ২০২৪ সালেও একবার পদত্যাগের দাবির মুখে পড়েছিলেন, তবু গদি নড়েনি। দুই বছরের ব্যবধানে, প্রায় একই অভিযোগে, একই ব্যক্তিকে এবার মাত্র কয়েক সপ্তাহের চাপে পদ ছাড়তে হলো। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এবার পরিণতি ভিন্ন হলো? এই প্রশ্নের উত্তরেই লুকিয়ে আছে ভারতের সাম্প্রতিক আন্দোলনের সফলতার কারণ।

এই আন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের এক মন্তব্যের রেশ ধরে। বিজেপির নামের ব্যঙ্গ করে যখন 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি) তৈরি হলো, তখন মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই সাড়ে তিন লাখ নিবন্ধন আর দুই কোটির বেশি অনুসারী জুটে যায় সংগঠনটির, ছাপিয়ে যায় বিজেপি ও কংগ্রেসের অনলাইন অনুসারী সংখ্যাও।

রাষ্ট্রের প্রথম প্রতিক্রিয়ায় চেনা ছকের পুনরাবৃত্তিই ছিল। বলা হলো, সিজেপির সিংহভাগ অনুসারী নাকি পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে। সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা দিপকে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই পাল্টা তথ্য হাজির করে দেখালেন, প্রায় ৯৫ শতাংশ অনুসারীই ভারতীয়, পাকিস্তান-বাংলাদেশ শীর্ষ পাঁচেও নেই। তথ্য-প্রতিরোধের এই সহজলভ্যতাই একটি গভীরতর রূপান্তরের ইঙ্গিত দেয়।

বিজেপি শাসনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার ছিল বিভিন্ন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে বিভিন্ন তকমা দাগিয়ে প্রান্তকরণ করে ফেলা। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে শাহিনবাগে যখন মুসলিম নারীরা টানা ১০১ দিন অবস্থান করলেন, তখন তাঁদের 'মুসলিম, পক্ষপাত' ও 'দেশবিরোধী' তকমা দেওয়া গিয়েছিল। জেএনইউ থেকে যাদবপুর পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলনগুলোকেও

একই কৌশলে 'আরবান নকশাল' ও 'বাম ষড়যন্ত্র' তকমা দেওয়া হয়েছিল। কৃষক আন্দোলনেও 'টুলকিট' আর 'খালিস্তানি অনুপ্রবেশ'-এর অভিযোগ তোলা হয়েছিল।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের কৌশল ছিল অভিন্ন, প্রতিবাদকে ইস্যুভিত্তিক নাগরিক অসন্তোষ হিসেবে না দেখিয়ে সাংস্কৃতিক-নিরাপত্তাজনিত হুমকি হিসেবে হাজির করা হয়েছিল। চেষ্টা করা হতো, সাধারণ মধ্যবিত্ত হিন্দু ভোটারের সঙ্গে আন্দোলনের দূরত্ব বজায় রাখা।

সিজেপির ক্ষেত্রে এ কৌশল ভেঙে পড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে, এই তকমা দাগানোর মতো উপাদানের অনুপস্থিতি। নেতৃত্বে কোনো পরিচিত বাম দল নেই, সামনের সারিতে কোনো ধর্মীয় সংখ্যালঘু সংগঠন নেই, গ্রামীণ কৃষকও নেই। যন্তর মন্তরে হাজির হয়েছে কোচিং সেন্টারের ছাত্র, ছোট শহরের চাকরিপ্রত্যাশী, নতুন স্নাতক আর গিগ-অর্থনীতির কর্মী, অথচ সুযোগ থেকে বঞ্চিত এক নাগরিক; মধ্যবিত্ত।

এদের 'জিহাদি' বা 'আরবান নকশাল' বলা কঠিন, কারণ, এরা একই সঙ্গে মোবাইল-অ্যাপনির্ভর সেবা, ডিজিটাল লেনদেন আর স্টার্টআপ-সংস্কৃতির স্বাভাবিক অংশীদার। রাষ্ট্রের পুরোনো তকমা দাগানোর রাজনীতি এই প্রথমবারের মতো একটি প্রকৃত কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হয়েছে।

আন্দোলনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এর ভিজ্যুয়াল বা দৃশ্য, সংস্কৃতি। সিজেপি মূলত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম-নির্ভর সংগঠন দি বলেই আন্দোলনও শুরু থেকে ভেবেছে, কোন মুহূর্ত ক্যামেরায় ধরা পড়ছে, কোন স্লোগান হ্যাশট্যাগ হয়ে উঠতে পারে। এই দৃশ্য-সচেতনতার সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইউটিউব চ্যানেল আনফিল্টার্ড বাই সামদিশ-এর কভারেজে বারবার শোনা এক সাধারণ আহ্বান, 'ক্যামেরাপারসন পার্থ, দেখাইয়ে'। সাংবাদিক সামদিশ ভাটিয়া প্রতিটি সংঘর্ষের মুহূর্তে যেভাবে তাঁর ক্যামেরাপারসনকে ডাকতেন, তা শিগগিরই দর্শকদের কাছে একধরনের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রতীক হয়ে ওঠে।

এর ফলাফল হচ্ছে, আগে যেখানে রাষ্ট্রের সহায়ক সংবাদমাধ্যম-কাঠামো একতরফা আখ্যান নির্মাণ করতে পারত, সেখানে এখন হাজারো ব্যক্তিগত ফোন-ক্যামেরা এবং কয়েকজন স্বতন্ত্র সাংবাদিকের ভাইরাল উপস্থিতি সেই আখ্যান-নিয়ন্ত্রণ ভেঙে দিয়েছে।

এই দৃশ্য-ক্ষমতার নিচে কাজ করছে আরেকটি গভীরতর মানসিক পরিবর্তন। এই প্রজন্ম বেড়ে উঠেছে অ্যাপনির্ভর সেবা-অর্থনীতির যুগে, যেখানে অভিযোগ জানানো মানেই ক তাৎক্ষণিক সাড়া, দৃশ্যমান জবাবদিহি এবং প্রয়োজনে বিকল্প সেবায় স্থানান্তরের অধিকার প্রত্যাশিত। রাষ্ট্রের প্রতি তাদের প্রত্যাশাও অনেকটা সেই একই যুক্তিতে গঠিত: নাগরিককে দীর্ঘমেয়াদি অনুনয়-বিনয়কারী প্রার্থী হিসেবে নয়, বরং একটি চুক্তিবদ্ধ সেবা-সম্পর্কের অংশীদার হিসেবে দেখার প্রবণতা।

এই মনস্তত্ত্বের কাছে রাষ্ট্রের চিরাচরিত ভয়-নির্ভর ভাষা, লাঠি, গ্যাস, বিদেশি হাতের অভিযোগ, ক্রমে অকার্যকর হয়ে পড়েছে। জুলাইয়ের মাঝামাঝি ওয়াংচুককে জোর করে হাসপাতালে সরিয়ে নেওয়া এবং প্রায় একই সময়ে হিন্দুত্ববাদী স্লোগান দেওয়া এক নারীর দিপকের গায়ে কালি ছোড়ার ঘটনা, দুটোই মূলধারার সংবাদমাধ্যমের দৃষ্টি আরও বেশি টেনে আনে। এই প্রতিটি ঘটনাই ডিজিটাল পরিসরে সহানুভূতি ও দৃশ্যমানতা বাড়িয়েছে।

এই সাফল্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে পৌঁছাবে কি না, সেই প্রশ্ন অবশ্য খোলাই থেকে যায়। ভারতের লোকপাল আইনের ইতিহাস সতর্ক করে দেয়, দ্রুত প্রতীকী জয় সব সময় গভীর কাঠামোগত পরিবর্তনে পৌঁছায় না; আইন প্রণয়নের পরও বাস্তবায়ন পিছিয়ে যেতে পারে বছরের পর বছর। তবু অন্তত এই মুহূর্তে এতটুকু স্পষ্ট, রাষ্ট্রকে জবাবদিহির টেবিলে টেনে আনার জন্য একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যাকরণ তৈরি হয়েছে এর পেছনে নিরেট অর্থনৈতিক বাস্তবতাও কাজ করছে। ভারতের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী ২০২৬ সালের জুনে তরুণ বেকারত্বের হার (১৫-২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে) দাঁড়ায় ১৬ দশমিক ২ শতাংশে, রেকর্ড সর্বোচ্চ, ২০২৫ সালের এপ্রিলের ১৩ দশমিক ৮ শতাংশ

থেকে বেড়ে। আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেট অব ওয়ার্কিং ইন্ডিয়া প্রতিবেদন বলছে, বেকার তরুণদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই স্নাতক, অথচ পুরুষ স্নাতকদের মধ্যে মাত্র ৬ দশমিক ৭ শতাংশ স্থায়ী বেতনভুক্ত চাকরি পান, প্রকৃত কেতাদুরস্ত পেশাগত চাকরিতে ঢুকতে পারেন মাত্র ৩ দশমিক ৭ শতাংশ।

প্রশ্নটা তাই কেবল জাতীয় টেস্টিং এজেন্সির পরীক্ষা জালিয়াতির নয়, বা সিবিএসইর মূল্যায়ন ত্রুটিরও নয়; প্রশ্নটা একধরনের যৌথ অভিজ্ঞতারও। যে প্রজন্মকে রাষ্ট্র 'মেধাতন্ত্রের সন্তান' বলে চিহ্নিত করতে চায়, অথচ বাস্তবে সেই মেধাতন্ত্র নিয়মিত ভেঙে পড়ছে প্রশ্নপত্র ফাঁস আর প্রাতিষ্ঠানিক অযোগ্যতার তলায়।

ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও কর্মহীনতার এই বাস্তবতাই রাষ্ট্রের যোগ্যতার ওপর সংশয় তৈরি করেছে এবং কৌতুকের আড়ালে জমে থাকা প্রকৃত ক্ষোভের রসদ জুগিয়েছে। ২০২৪ সালেও যখন একই অভিযোগ উঠেছিল, তখনো এই ক্ষোভের মাত্রা এতটা প্রকট ছিল না। প্রতিবাদও ছিল মূলত সংসদকেন্দ্রিক। দুই বছরের ব্যবধানে সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভই এবার রাস্তায় নেমে এসেছে।

সবচেয়ে ব্যক্তিগত তুলনাটা টানা যায় ওয়াংচুকের নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে। লাদাখকে সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলে অন্তর্ভুক্তি ও রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে তিনি ২০২৪ সালের মার্চে একুশ দিন এবং ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে পঁয়ত্রিশ দিন অনশন করেছিলেন, দুই দফাতেই সরকারের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর আংশিক ছাড় মিললেও মূল সাংবিধানিক দাবি অধরাই থেকে গেছে।

এবার সিজেপির পাশে দাঁড়িয়ে ২৮ জুন থেকে মাত্র ছাব্বিশ দিনের অনশনে আন্দোলনের কেন্দ্রীয় দাবি বাস্তবে রূপ নিল। শরীর একই, ত্যাগও একই, রাষ্ট্রও একই, তফাত কেবল কৌশলে, একদিকে দীর্ঘ, একলা, আত্মত্যাগনির্ভর রাজনীতি, যেখানে রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ধীর দর-কষাকষির, অন্যদিকে দ্রুত, সমষ্টিগত, তথ্যনির্ভর ও ব্যঙ্গাত্মক দাবি আদায়ের

রাজনীতি, যেখানে লাখ লাখ তরুণ নিজেদের রোজকার ডিজিটাল অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছে যে প্রতিকার চাইতে দেরি করার প্রয়োজন নেই।

শুরুতেই যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে তার উত্তর আছে এই তিনের মিশেলে। প্রথমত, বিজেপি শাসনের সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র, অর্থাৎ দায়িত তকমা দাগানো, এখানে কার্যকর হয়নি। কারণ, আন্দোলনের সামাজিক গঠন সেই তকমা উপযোগী উপাদান সরবরাহ করেনি।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের ভয়নির্ভর দমনযন্ত্র কৌতুক ও স্বাধীন দৃশ্য-সাংবাদিকতার মুখে ভোঁতা হয়ে পড়েছে। প্রতিটি দমন-পদক্ষেপ উল্টো সহানুভূতি ও দৃশ্যমানতায় রূপান্তরিত হয়েছে। তৃতীয়ত, স্নাতক-বেকারত্বের নির্মম বাস্তবতা আন্দোলনকে এমন এক নৈতিক ভিত্তি জুগিয়েছে, যা নিছক কৌতুককে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করেছে। এই তিনের মিশেলেই ২০২৪ সালে যা অসম্ভব ছিল, তা ২০২৬ সালে সম্ভব হয়েছে।

"এ আই এর উত্তর ভূল ও বিভ্রান্তিপূর্ন হতে পারে"

-সুচিত্রা কার্তিকেয়ন

এই সপ্তাহে একটি প্রবন্ধের জন্য গুগল সার্চে যখন আমি লিখলাম, "প্রম্বানন মন্দির পরিদর্শনকারী প্রথম ভারতীয় নেতা", তখন উত্তরে দেখানো হলো যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীই এই ঐতিহাসিক মন্দির পরিদর্শনকারী প্রথম ভারতীয় নেতা। তবে আমার মনে একটা খটকা লাগল, কারণ ভারত ও ইন্দোনেশিয়া সামরিক ও সাংস্কৃতিক—উভয় ক্ষেত্রেই ১৯৪০-এর দশক থেকে সহযোগিতা করে আসছে। যাচাই করার জন্য আমি দ্য হিন্দু-র সিমান্টিক সার্চ ব্যবহার করলাম, যা এক শতাব্দীরও বেশি সময়ের সংবাদপত্র আর্কাইভ ঘেঁটে দেখে। দ্য হিন্দু-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৯৫৮ সালের ১৪ ডিসেম্বর, ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ইন্দোনেশিয়ায় তাঁর সরকারি সফরকালে গাড়িতে করে প্রম্বানন মন্দিরে যান। 'Monument of Buddha' শিরোনামের প্রবন্ধটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ডঃ প্রসাদ এই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগের সহায়তায় চলমান সংস্কার কাজের প্রশংসা করেছিলেন।

আমি একই প্রশ্ন চ্যাটজিপিটি, জেমিনি এবং গ্রক-সহ বিভিন্ন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সরঞ্জামকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এবং একই উত্তর পেয়েছি—যে মিঃ মোদীই এই মন্দির পরিদর্শনকারী প্রথম ব্যক্তি।

এ আই-এর সীমাবদ্ধতা আরও বিশ্লেষণ করার জন্য, আমি চ্যাটজিপিটি এবং জেমিনি উভয়কেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম "প্যালেস্টাইন পরিদর্শনকারী প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী কে"; উত্তর এল—নরেন্দ্র মোদী, ২০১৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি, যখন তিনি পশ্চিম তীরের রামাল্লা পরিদর্শন করেন এবং প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে আলোচনা করেন। তবে দ্য হিন্দু-র আর্কাইভ ঘেঁটে দেখা যায় যে জওহরলাল নেহরুই গাজা উপত্যকা

পরিদর্শনকারী প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী, যিনি ১৯৬০ সালের ১৯ মে সেখানে যান। ১৯৬০ সালের ২০ মে তারিখের একটি প্রতিবেদনে দ্য হিন্দু বর্ণনা করেছে যে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে (মিশর ও সিরিয়ার স্বল্পস্থায়ী মিলনে গঠিত রাষ্ট্র, ইউএআর) তাঁর সরকারি সফরকালে মিঃ নেহরু একদিনের সফরে জাতিসংঘ জরুরি বাহিনী ও প্যালেস্টাইনি শরণার্থী শিবিরে যান। তাঁর এই সফর ইসরায়েলি সুপার-মিস্টের যুদ্ধবিমানের কারণে বিঘ্নিত হয়েছিল, যেগুলি তাঁকে বহনকারী জাতিসংঘের বিমানের ওপর চক্কর কেটেছিল—তখন ইউএআর-এর সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীন প্যালেস্টাইনের আকাশসীমা লঙঘন করে।

এ আই সরঞ্জামগুলির দেওয়া ফলাফল দেখায় যে, মিঃ নেহরুর সফর সম্পর্কে একাধিক সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থাকা সত্ত্বেও, এ আই এর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, কারণ মিঃ নেহরুর সফরটি ছিল গাজায়—যা তখন ইউএআর-এর দখলে ছিল। এটি মিঃ মোদীর রামাল্লা সফরকেই প্রথম দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছে, কারণ সেটি প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষের শাসনাধীন ছিল। অথচ ভারত ১৯৪৮ সালেই প্যালেস্টাইন (গাজা উপত্যকা ও পশ্চিম তীর নিয়ে গঠিত) এবং ইসরায়েল—উভয়কেই স্বীকৃতি দিয়েছিল। বছরের পর বছর ধরে পশ্চিম তীর ও গাজা উভয় অঞ্চলেই শাসক কর্তৃপক্ষের পরিবর্তনশীল প্রকৃতি বিবেচনা করলে, কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের এই দুই ভূখণ্ডের যে কোনো একটিতে সফরকেই হিসেবের মধ্যে আনা উচিত।

এ আই-এর সীমাবদ্ধতার আরেকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল যখন আমি জেমিনি এবং চ্যাটজিপিটিকে এই প্রশ্ন করলাম: "আয়োধ্যার রাম মন্দির কি মার্কিন সেনেটর বা কংগ্রেসম্যানরা পরিদর্শন করেছেন?" জেমিনি জানাল যে কোনো বর্তমান বা প্রাক্তন মার্কিন সেনেটর বা কংগ্রেসম্যান এই মন্দির সশরীরে পরিদর্শন করেছেন বলে কোনো প্রকাশ্য নথি বা সরকারি নিশ্চিতকরণ নেই, অন্যদিকে চ্যাটজিপিটি ভুলভাবে জানাল যে ২০২৪ সালে একটি মার্কিন কংগ্রেসনাল প্রতিনিধিদল এই মন্দির পরিদর্শন করেছিল।

দ্য হিন্দু-র আর্কাইভ সার্চে দেখা যায় যে ১৯৯৩ সালের ৩ নভেম্বর, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রায় এক বছর পর, নয় সদস্যের একটি মার্কিন সেনেটর প্রতিনিধিদল রাম জন্মভূমি চত্বর পরিদর্শন করেছিল। ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতাদের সঙ্গী হিসেবে নিয়ে, স্টিভেন মোর্সের নেতৃত্বাধীন এই প্রতিনিধিদল সেখানে রাম লালাকে রাখা অস্থায়ী তাঁবুটি পরিদর্শন করেছিল। মিঃ মোর্স স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন যে তাঁদের সফরের উদ্দেশ্য ছিল "দেশের গণতান্ত্রিক কার্যপ্রণালী ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন করা", কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নয়।

এ আই-এর ক্রমাগত শেখার সক্ষমতা সত্ত্বেও, দ্য হিন্দু-র মতো শতাব্দী প্রাচীন সংবাদপত্রের আর্কাইভ ব্যবহারকারীর পছন্দ, রাজনৈতিক মতাদর্শ ও সার্চ প্যাটার্নের ছাঁকনি ছাড়াই তথ্য উপস্থাপন করে। উপরোক্ত উদাহরণগুলি এআই-এর তথ্য যাচাইয়ের অভাব, পুরনো সংবাদ প্রতিবেদনে সীমিত প্রবেশাধিকার এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ব্যর্থতা তুলে ধরে। এটি প্রথাগত সংবাদপত্রগুলির জন্য তাদের পুরনো সাংবাদিকতা তুলে ধরে আরও বেশি ডিজিটাল প্রতিবেদন প্রদানের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়, যাতে প্রকৃত সত্য প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

Kuldip Singh, in an exclusive interview, gives details of the Khalra killing, which is likely to give a new twist to the investigations

'I heard two shots and I ran back. Khalra had stopped breathing'

SATINDER BAINS
AMRITSAR, MAY 5

HE was made to stand, thrashed and pushed onto the ground. His legs were stretched apart, more than 180 degrees. Seven policemen kicked him in the abdomen and chest. Save me. Please give me some water, he cried. As I was about to fetch some water, I heard two shots. I ran back into the room and found him bleeding profusely. He had stopped breathing. This is how human rights activist Jaswant Singh Khalra was killed around 8 p.m. on October 27, 1995, at the Chhabal police station of Amritsar district and his body was thrown into the Harike canal."

This was disclosed by Kuldip Singh, Special Police Officer and prime witness in the sensational Khalra disappearance case, to *The Indian Express* in an exclusive interview here today.

SPECIAL REPORT

The entire operation at the Chhabal police station where Khalra had been kept after being kidnapped by the police under orders from SSP Ajit Singh Sandhu, was supervised by Deputy Superintendent of Police Jaspal Singh, Kuldip said. Ajit Singh Sandhu had later committed suicide.

"You had been told not to proceed against us but you didn't agree," shouted Jaspal Singh at Khalra as I opened the door of the room where he had been kept. The other policemen, who too had reached there in a private Maruti, then pounced upon him," Kuldip disclosed.

Khalra, he narrated, started crying loudly and pleaded for water when he was not able to withstand the torture. "SHO Satnam Singh told me to bring hot water. As I was on my way to do the needful, they shot him in the neck and chest," he added.

These startling revelations are likely to give a new twist to the investigation in the Khalra disappearance case.

When confronted with these revelations, DGP P. C. Dogra declined to comment, saying he had not seen the SPO's statement.

According to Kuldip Singh, at the time of gunning down of Khalra, there were six other policemen on the spot, including DSP Jaspal Singh, Arvinder Singh, Surinderjit Singh, Jasbir Singh, Pirthipal Singh and Balwinder Singh Ghora.

After disposing off the body, they all went to the Harike Rest House where Ajit Singh Sandhu was waiting. He said the murder was celebrated with drinks till midnight. He and two gunmen were also given two bottles of

CONTINUED PAGE 9

Jaswant S. Khalra

Kuldip Singh

Chronology of events

- 6.9.1995: Jaswant Singh Khalra is kidnapped from outside his residence.
- 9.9.1995 : Paramjit Kaur, wife of Jaswant Singh Khalra, files a writ petition in the Supreme Court. It is attached to the main writ on cremation of bodies filed on 3.4.1995 by the Committee for Information and Initiative on Punjab).
- 13.10.1995 : The Supreme Court directs the Punjab Government to file an affidavit on the abduction of Khalra within three weeks.
- 24.10.1995 : Kikkar Singh , an eye-witness in the case, sees Khalra at the Kang police station.
- 28.10.1995 : Khalra is believed to have been shot dead in the Chhabal police station as Kuldip Singh, gunman of SHO Satnam Singh, deposes before CBI.
- 3.11.1995: The Punjab Government files an affidavit in the Supreme Court stating that the whereabouts of Khalra are not yet known.

CONTINUED PAGE 9

মানবাধিকার কর্মীর জীবন নিয়ে ছবি : ৮০ ও ৯০ দশকের পাঞ্জাব : অতীতকে ফিরে দেখা কেন জরুরী

- পুরুষোত্তম রায় বর্মন

যশবন্ত সিং খালড়া, জন্ম ১৯৫২, জেলা, তরণ তারন, পাঞ্জাব। ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, কবীর পার্ক, অমৃতসর। মেয়ে নবকিরণ ও ছেলে জনমিতকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে বাড়ির সামনের লনে টাটা মোবাইল গাড়ি পরিষ্কার করছিলেন। একটি নীল মারুতী গাড়ি খালড়ার বাড়ির সামনে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে নেমে পরে সাদা পোশাকের পুলিশরা। নিমেষের মধ্যেই কিছু বোঝার আগেই খালড়াকে গাড়িতে তুলে নেয় তারা। খালড়ার স্ত্রী পরমজিত ও তার সহকর্মীরা খালড়ার সন্ধানে এক থানা থেকে আরেক থানায় মাথা খুঁড়ে। না, পুলিশের কোন কিছুই জানা নেই খালড়ার ব্যাপারে। কোন থানাই খালড়াকে গ্রেফতার করেনি। দু-দিন পর থানা এফ আই আর দায়ের করে অজ্ঞাত পরিচয় উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে। তারা নাকি খালড়াকে অপহরণ রয়েছে।

সত্যের পাতাল এফোঁড় ওফোঁড় :

কখনো কোন সত্য পাতাল এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে আসে। ৬ই মে, ১৯৯৬, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকার প্রথম পাতায় বক্স নিউজ। বক্স নিউজে কুলদীপ সিং এর সাক্ষাৎকার। কুলদীপ সিং, পাঞ্জাব পুলিশের গাড়ি চালায়। কুলদীপ সিং সাক্ষাৎকারে জানায় যে, খালড়াকে পাঞ্জাব পুলিশই অপহরণ করেছিল এবং সেই গাড়ির চালক ছিল কুলদীপ সিং স্বয়ং। বাড়ি থেকে অপহরণ করে তুলে নিয়ে খালড়ার উপর নির্মম অত্যাচার করে পাঞ্জাব পুলিশ। খালড়াকে খুন করে মৃতদেহ অমৃতসরের দক্ষিণ পশ্চিমে ৪০ কিলোমিটার দূরে একটি খালে ফেলে দেয়। বিবেকের তাড়নায় কূলদীপ সিং জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়ে সত্য ফাঁস করেন। এর জন্য চরম খেসারত দিতে হয় কূলদীপ সিং । গ্রামের বাড়ির কাছে কূলদীপ সিং এর মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃত্যুর কিনারা কোনদিনই হয়নি। অবশ্য মৃত্যুর আগে কূলদীপ সিং কাজের কাজটি করতে পেরেছিলেন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে সাক্ষাৎকারে যা বলেছিলেন তাই সিবিআই আদালতে সাক্ষী হিসেবে বলে যান। ততদিনে যশবন্ত সিং খালড়ার মামলার চরিত্র বদল হয়েছে। প্রথমে অপহরণের মামলা, পরে অপহরণ ও খুনের মামলা। অপহরণ ও খুনের মামলায় অভিযুক্ত সবাই পাঞ্জাব পুলিশে কর্মরত। কেউ পুলিশ সুপার, কেউ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, কেউবা থানার ওসি কনস্টেবল ইত্যাদি। CBI আদালতে অভিযুক্তরা সবাই দোষী সাব্যস্ত হয়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। সুপ্রিম কোর্ট অব্দি সাজা বহাল থাকে। অন্যতম আসামী এস এস পি সান্ধু আত্মহত্যা করে ১৯৯৭ সনে।

এক লাশ ইতনি ভারী:

--------—------------------

যশবন্ত সিং খালড়ার শবদেহ এততা ভারী হবে পাঞ্জাব পুলিশ কল্পনাও করতে পারেননি। পাথরের মত ভারী মৃত্যু। পাখির পালকের মত পলকা মৃত্যু নয়। অপহরণ করে যশবন্ত সিং খালড়ার পার্থিব শরীরটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু খালড়া এক কিংবদন্তি নায়ক। খালড়ার ভূত রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থা নতুন করে দেখছে। শুধু পাঞ্জাব জুড়েই নয়। দেশ জুড়ে। যশবন্ত সিং খালড়ার জীবনী নিয়ে বায়োপিক তৈরি হয়েছে। শতলুজ। পরিচালক হানি ট্রেহান। খালড়ার জীবনের সত্য কাহিনী নিয়ে। নায়ক দিলজিত ডোসানজি। ওটিটি প্লেটফর্মে ছবিটি মুক্তি পায়। যদিও ছবিটি সেন্সর বোর্ড অনুমোদিত, কিন্তু ভারতে ছবিটির প্রচারে ভারত সরকারের আপত্তি রয়েছে। জি-ফাইভ ছবিটি ওটিটি প্লাটফর্ম থেকে তুলে নিয়েছে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় প্রকাশিত সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে হিন্দু - শিখ উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে ছবিটি দেখছেন।

ডি এন এ তে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ :

যশবন্ত সিং খালড়ার পিতামহ গদর আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। বিশ শতকের প্রথম দিকে বিদেশে বসবাসকারী শিখরা সশস্ত্র উপায়ে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদে সংঘটিত হয়েছিল। শত শত গদর বিপ্লবী শহীদের মৃত্যু বরণ করেছিলেন। খালড়ার পিতামহ ব্রিটিশ কারাগারে সাংহাইতে মারা যান। খালড়ার পিতা স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় জেল কেটেছেন। খালড়ার রক্তে ছিল দেশপ্রেম। জন্ম সূত্রে জাট শিখ যশবন্ত সান্ধু পদবী গ্রহণ করেন নি। গ্রামের নাম খালড়াকে পদবি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

জাত প্রথার তথাকথিত কুলিনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। শৈশবেই বিপ্লবী সাহিত্যের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সাহীর লুধিয়ানী ও সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার গভীর অনুরাগী যশবন্ত । স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে যশবন্ত সিং পুনরুজ্জীবিত করেন শহীদী আজম ভগৎ সিং দ্বারা ১৯২৬ সনে প্রতিষ্ঠিত ভারত নওজোয়ান সভাকে। শ্রমিক ইউনিয়নের উন্নত মজুরির দাবির সাথে যশবন্ত সিং অনশন করেছেন। বাস ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে জেল

খেটেছেন। আন্দোলনের চাপে পাঞ্জাব সরকার ছাত্রদের জন্য বাসে কন্সেশন চালু করতে বাধ্য হয়।

ষাটের দশকের শেষ দিকে সারা দেশের সাথে পাঞ্জাবও উত্তাল। আদর্শবাদী ছাত্র যুবরা দলে দলে নকশাল আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন। তথাকথিত পুলিশি এনকাউন্টারে ছাত্র যুব সক্রিয়তাবাদীদের হত্যা। যশবন্ত সিং পুলিশী এনকাউন্টারের যাবতীয় তথ্য, নিহতদের তালিকা ইত্যাদি অনুপুংখ ভাবে নথিপত্র ও লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব তুলে নেন। ১৯৭৩ সালে এই বিষয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করেন যশবন্ত সিং খালড়া। মানবাধিকার আন্দোলনে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের সূচনা।

অপারেশন ব্লু স্টার, অচেনা পাঞ্জাব।

জুন ১৯৮৪, অপারেশন ব্লু স্টার। অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরে সেনা বাহিনীর প্রবেশ। মন্দিরের অভ্যন্তরে ঘাটি গেড়ে বসে থাকা জারনাল সিং ভৃন্দায়ানওয়ালা ও তার সশস্ত্র অনুগামীদের সাথে সেনাবাহিনী সংঘর্ষ। দু পক্ষের গোলাগুলিতে স্বর্ণ মন্দিরে আটকে পড়া বহু শিখ তীর্থযাত্রী নিহত ও আহত । পাঞ্জাব জুড়ে ছড়িয়ে পরে সশস্ত্র খালিস্তানি আন্দোলন। পাঞ্জাবকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন খালিস্তান করার জন্য রক্ত বন্যা। খালিস্তানিদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু শুধুমাত্র রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্রের বাহিনীই নয় । শিখ- হিন্দু ঐক্যের পক্ষে, সাম্রাজ্যবাদী মদতপুষট খালিস্থানীদের নির্বিচার হিংসার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন সিপিআইএম ও সি পি আই এর নেতৃত্বে পাঞ্জাবের বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি। ওই সময় অসংখ্য বামপন্থী নেতাকর্মীকে খালিস্থানীরা হত্যা করে। খালিস্তান আন্দোলন দমনের জন্য আরক্ষা বাহিনী ও সেনাবাহিনীর হাতে অবাধ ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়। কেপিএস সিং গিলকে পাঞ্জাব পুলিশের প্রধান করা হয়। জবাবদিহিহীন ক্ষমতা ভয়ংকর ও মারাত্মক। অরাষ্ট্রীয় সশস্ত্র গোষ্ঠীর হিংসা ও নৃশংসতার জবাব রাষ্ট্রীয় বাহীনির নির্বিচার হিংসা ও লাগামহীন সন্ত্রাস হতে পারে না। পাঞ্জাব পুলিশের হাতে অবাধ ক্ষমতা, নাকের বদলে নাক চোখের

বদলে চোখ, এই রননীতি বাস্তবে প্রয়োগ করতে গিয়ে বহু নিরীহ মানুষ হত্যার প্র্যামাণ্য অভিযোগ রয়েছে পাঞ্জাব পুলিশের বিরুদ্ধে। পুলিশের দাবি মত উৎকোচ ও টাকা দিতে না পারলে যে কোন মানুষকে খালিস্তানি বলে দাগিয়ে হত্যা করে এনকাউন্টারে মৃত বলে চালানো হয়েছে। পাঞ্জাব এক যুদ্ধ ক্ষেত্র। একদিকে রাষ্ট্র তার সমস্ত বাহিনী নিয়ে খালিস্তানিদের সাথে সম্মুখ সমরে। বামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি একই সাথে খালিস্তানিদের সাথে সম্মুখ সমরে। অন্যদিকে খালিস্থানী আন্দোলন দমনের নামে পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের উপর পাঞ্জাব পুলিশের প্রচন্ড রকম অত্যাচার, নির্যাতন, অপহরণ করে গুম করে দেওয়া। মুখ খোলার কোনো সুযোগ নেই। মুখ খুললেই অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতিকারীরা, যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাদা পোশাকের পুলিশ, বাড়িতে থেকে তুলে নিয়ে নিখোঁজ করে দেবে । নিখোঁজের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে প্রতিদিন। এ অবস্থায় দেশের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনগুলো নিখোঁজদের পরিবারের পাশে এসে দাঁড়ায়। বিচারপতি এইচ এম তারাকুনডের নেতৃত্বে পাঞ্জাব পর্যবেক্ষক দল আসে পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অব্যহিত হতে। তাদের সাথে যুক্ত হন যশবন্ত সিং খালড়া।

কথা বলা বারণ :

অমৃতসরের লাগোয় তিনটি জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে নিখোঁজদের তালিকা তৈরি করেন যশবন্ত সিং খালড়া। ১৯৯২ সনে যশবন্ত সিং খালড়া ও তার সতীর্থরা মানবাধিকার সংগঠন তৈরি করেন। ততদিনে যশবন্ত সিং খালড়ার অমৃতসরের সমবায় ব্যাঙ্কের ডাইরেক্ট নির্বাচিত হয়েছেন। খালড়ার স্ত্রী গুরুনানক বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান পদে কর্মরত। পাঞ্জাবের উত্তাল পরিস্থিতিতে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে মুখ খোলা "ভয়ংকর অপরাধ"। সত্য উচ্চারণ করা যাবে না। পুলিশের দ্বারা অপহরণ ও হত্যা নিয়ে কথা বলা একদম বারণ। মানবাধিকার নিয়ে কথা বললেই দাগিয়ে দেওয়া হবে খালিস্তানি বলে। বিচারপতিদের গ্রেপ্তার

করা হচ্ছে মানবাধিকার নিয়ে কথা বলার জন্য। কথিত এনকাউন্টারকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য।

মায়েদের ব্যাকুল কান্না :

নাম তার কানসো। ৪৫ - ৫০ বছরের মহিলা। চোখ মুখ সহ সারাশরীরে ঝড়ের ছাপ। অনেকটাই অপ্রকৃতিস্থ। প্রতিদিন অমৃতসরের চাবাল এলাকায় থানার সামনে দাড়িয়ে থাকত এই নারী। পুলিশের উপর অবিশ্রান্ত অভিশাপ ছুড়ত। কানসোর তিন ছেলে ও স্বামীকে পাঞ্জাব পুলিশ বাড়ি তুলে নিয়ে যায়। তারপর থেকে তারা নিখোঁজ। যশবন্ত সিং তার এক সহকর্মীকে ওই নারীর বাড়িতে যান একদিন। সমস্ত বাড়িটি একটি ধ্বংসস্তূপ। আর্তনাদের কারাগার। বাড়ি থেকে বেড়িয়ে খালড়া তার সহকর্মীকে বলেন আমাদেরকে কিছু একটা করতে হবে। ঐ নারী একা নন। পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে স্বজনহারাদের বিলাপ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিযোগ তথাকথিত এনকাউন্টারে হত্যা করা হয়েছে পাঞ্জাব পুলিশকে খুশি তুষ্ট না করতে পারার জন্য।

সত্যকে খুঁজে আনো :

যত কষ্টই হোক সমস্ত তথ্য সংগ্রহ কর। যশবন্ত সিং খালড়া ও তার সতীর্থদের শুরু হল বিরামহীন বুদ্ধিদীপ্ত প্রচেষ্টা। একদিন খালড়া ও তার সতীর্থ রানধাওয়া অমৃতসরের দুর্গিয়ানা মন্দির শ্মশান ঘাটে যান। শ্মশানঘাটের রেজিস্টার দেখে তাদের চক্ষু চড়ক গাছ। রেজিস্টারের পাতায় পাতায় রয়েছে দাবিহীন শবদেহ পোড়ানোর তথ্য। সবগুলো শবদেহ দাহের জন্য নিয়ে এসেছিল পাঞ্জাব পুলিশ। শুধুমাত্র একটি শ্মশানঘাটই নয়। একের পর শ্মশানের একই চিত্র। শ্মশান গুলোর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা তাদের জানিয়েছেন, অনেক সময়ই ৩টি শব দেহকে একসাথে বেঁধে পোড়াতে হয়েছে। যশবন্ত সিং খালড়া ও তার সহকর্মীরা পৌরসভার নথী থেকে বের করে আনেন দাবীহীন মৃতদেহ গুলো পোড়ানোর

জন্য বরাদ্দ করা কাঠের হিসাব। শুধু তাই নয়, কোন কোন পুলিশ অফিসার কোন কোন দিন কতগুলো দাবীহীন শববেহ নিয়ে এসেছিল তাদের বিশদ পরিচয় সংক্রান্ত প্রামাণ্য নথিভিক্তিক আকাট্য তথ্যের আকড়। তথাকথিত এনকাউন্টারে নিহতদের প্রামাণ্য তালিকা।

জানুয়ারি, ১৯৯৫ সাংবাদিক সম্মেলন :

জানুয়ারি ১৯৯৫ খালড়া সাংবাদিক সম্মেলন করলেন। সাংবাদিকদের সামনে তথ্য প্রমাণ ও নথির ভিত্তিতে দাবি করলেন, অমৃতসরের লাগোয়া তিনটি জেলায় ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৪ এই ১০ বছরে পাঞ্জাব পুলিশ গোপনে ২০০০ দাবীহীন ও অশনাক্ত মৃতদেহের সৎকার করেছে। মৃতদের সবাইকে তথাকথিত এনকাউন্টারে ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। অমৃতসরের প্রেস কনফারেন্সের শুরু হতেই পাঞ্জাব পুলিশ চড়াও হয়। জোর করে করে বন্ধ করে দেয় সাংবাদিক সম্মেলন। যশবন্ত সিং তার সতীর্থরা গোপনে চন্ডীগড়ে চলে যান। সেখানে সাংবাদিক সম্মেলন করেন।

জনস্বার্থ মামলা :

তথাকথিত পুলিশ এনকাউন্টারের শত শত হত্যার তদন্ত ও বিচার চেয়ে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করা হয়। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট জনস্বার্থ মামলা গ্রহণ করেনি। যশবন্ত সিং খালড়ারা সুপ্রিম কোর্টে যান। সুপ্রিম কোর্ট মামলা গ্রহণ করে ও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়। পরবর্তী সময়ে সি বি আই তদন্তে যশবন্ত সিং খালড়ার অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আক্রোশের কেন্দ্রবিন্দুতে খালড়া :

কে পি এস সিং বাহিনীর কলংক নগ্ন করার তথাকথিত 'অপরাধের' জন্য যশবন্ত সিং খালড়ার বিরুদ্ধে ক্ষোভে আক্রোশে ফুঁসছে পাঞ্জাব পুলিশ মধ্যেকার

অপরাধী চক্র। যারা খালিস্তানি বিচ্ছিন্নবাদী আন্দোলন মোকাবেলাকালীন ১০ বছরে ক্ষমতার ব্যাপক অপব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা কামাই করেছে এবং নিরীহ মানুষদের খুন করার অপরাধ তথাকথিত এনকাউন্টার হত্যার গল্পে চাপা দিয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, ক্ষমতাতন্ত্র অপরাধীদের পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিল। যশবন্ত সিং খালড়ার মুখ বন্ধ জন্যই তাকে অপহরণ করে হত্যা করে পাঞ্জাব পুলিশ। আইনের পথে ন্যায় ও সত্য অর্জনের লড়াইকে পরাস্ত করতে অপহরণ ও হত্যা দিয়ে দমন করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাঞ্জাব পুলিশ। অমৃতসরের এস এস পি সান্ধু প্রতিনিয়ত খালড়াকে হুমকি দিতে শুরু করে।

সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ : বিচারের জন্য দীর্ঘ লড়াই :

খালড়ার অপহরণের অব্যবহিত পরে শিরোমণি গুরুদোয়ারা প্রবন্ধক কমিটির প্রধান গুরুচরন সিং তোহরা সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি কুলদীপ সিংকে বেতার বার্তা প্রেরণ করে জানান, যশবন্ত সিং খালড়াকে পাঞ্জাব পুলিশ অপহরণ করেছে। এই তার বার্তাকে হেবিয়াস করপাস মামলা হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট গ্রহণ করে। খালড়ার স্ত্রী পৃথক ভাবে হেবিয়াস করপাস মামলা দাখিল করে সুপ্রিম কোর্টে। খালড়ার স্ত্রী নির্দিষ্ট ভাবে অভিযোগ করেন তরন তারন জেলার এস এস পি অজিত সিং সান্ধুর নির্দেশেই তার স্বামীকে অপহরণ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে পাঞ্জাবে তথাকথিত এনকাউন্টারে নিরীহদের অপহরণ, খুন ও গোপনে পুলিশী সৎকারের খালড়া দ্বারা সংগৃহীত তথ্য ও নথি পেশ করা হয়। ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৯৫ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি কুলদীপ সিং ও এস সাগির আহমেদ এক গুরুত্বপূর্ণ আদেশে সি বি আই কে নির্দেশ দেন, খালড়া অপহরণ ও বিচার বহির্ভূত হত্যার বিষয়ে তদন্ত করতে। সি বি আই তদন্তে বিচার বহির্ভূত হত্যার অভিযোগ যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে। খালড়ার খুন অপহরণের জন্য নয় জন পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে চার্জ শীট দেওয়া হয় দেওয়া হয় এর মধ্যে ৫ জনের শাস্তি হয়েছে।

অতীতকে ফিরে দেখতে হয় :

অতীতকে চাপা নয়। অতীত থেকে শিক্ষা জরুরী। যশবন্ত সিং খালড়ার জীবন কাহিনী নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র সম্প্রসারণ বন্ধ করে দেওয়ায় কতগুলো জরুরী প্রশ্ন জনপ্ররিসরে উঠে এসেছে। 'শলতুজ' শুধু একজন মানবাধিকার কর্মীর জীবন কাহিনী নয়। জারনাল সিং ভৃন্দায়ানওয়ালার উত্থান, স্বর্ণমন্দিরের অভ্যন্তরে সশস্ত্র ঘাটি স্থাপন, অপারেশন ব্লু স্টার, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর নৃশংস হত্যা, উত্তর ভারতের শিখদের বিরুদ্ধে জেনোসাইড, পাঞ্জাবে খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হিংসাত্মক অভিযান, অখন্ড পাঞ্জাবি জাতিসত্তাকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের চেষ্টা, হিন্দু - শিখ ঐক্য ভাঙ্গার জন্য খালিস্তানিদের প্রচেষ্টা, খালিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাম গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতিরোধ, খালিস্তানিদের দমনে পাঞ্জাব পুলিশের নির্বিচারে দমনপীড়ন, শত শত নিরীহ যুবককে ঠান্ডা মাথায় তথাকথিত এনকাউন্টারে খুন করা, ধর্মীয় রাজনীতির বীভৎসতা, মৌলবাদী রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেওয়ার করুন পরিণতি, খালিস্তানিদের বিরুদ্ধে জেহাদের নামে সৃষ্ঠ শ্বাস রুদ্ধকর পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস, এরই মধ্যে প্রেম, ভালোবাসা ও মানবতার মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা, ন্যায় ও সত্যের জন্য সাধারণ মানুষের অসম সাহসী লড়াই সত্য উদঘাটনে মানবাধিকার কর্মীদের অকুতোভয় জীবন মরণ সংগ্রাম : সব উঠে এসেছে শতলুজে। দু-দশকের পাঞ্জাবের জীবন্ত ছবি শতলুজে উপস্থিত। শতলুজ খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মহিমান্বিত করেনি। বরং শতলুজ ৮০ এবং ৯০ এর দশকের পাঞ্জাবকে বুঝতে সাহায্য করে।

মৌলবাদী হিংসার বিরুদ্ধে সম্প্রীতির পক্ষে:

যশবন্ত সিং খালড়া খালিস্তানি হিংসার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভাবে সোচ্চার ছিলেন। প্রতিবাদ আন্দোলনের শান্তিপূর্ণ পন্থায় আস্থাশীল ছিলেন খাড়লা। ১৯৮৬ সনে অমৃতসরের খালিস্তানিরা যখন বাস থেকে হিন্দু যাত্রীদের নামিয়ে খুন করে, তখন

খালড়া তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন। ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পুনরুত্থান আটকাতে মতাদর্শগত লড়াই জরুরি। দুদশকের ভয়াবহ অতীতকে চাপা দিয়ে ধর্মীয় মৌলবাদের পুনরুত্থানের বিপদকে আটকানো যায় না। শতলুজের উপর নিষেধাজ্ঞা বাক্ স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের মৌলিক অধিকারের উপর আক্রমণ। অতীতের বীভৎসতা ও অতীতকে কার্যকারণ সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেই প্রকৃত ঘৃণা তৈরি হবে ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হিংসার বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রীয় দমন পীড়নের বিরুদ্ধে। শতলুজ এর প্রচার বন্ধ করা দুরভিসন্ধি মূলক এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী ও মৌলবাদের হাতকে শক্ত করা হয়েছে।

জবাবদিহিহীন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভয়ংকর। দুদকের পাঞ্জাবের ঘটনা প্রবাহ এই শিক্ষাই দেয়। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও অ-রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেই মানবাধিকার কর্মীরা দৃঢ় অবস্থান পালন করে। উভয় ধরনের সন্ত্রাসের প্রতিটি ঘটনাকে নথিবদ্ধ করার চেষ্টা করে মানবাধিকার কর্মীরা। তারই পরিনতিতে খালড়াকে জীবন দিতে হয়েছে। অনেক মানবাধিকার কর্মীর একই পরিণতি হয়েছে।

অতীতের ক্ষতকে ফিরে দেখা জরুরি। তবেই অতীতের ক্ষতের পুনরুত্থান নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। বস্তুনিষ্ঠ ভাবে অতীতকে ফিরে দেখা অতীতের ক্ষতে পুন :সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক।

জীবন দিয়ে নৈ:শব্দের দেওয়াল ভাঙ্গা :

যশবন্ত সিং খালড়ার কন্যা নবকীরন শৈশব বাবাকে হারিয়েছে। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে নবকীরন যথার্থই বলেছেন, "যখন বাবাকে অপহরণ করা হয় তখন পাঞ্জাব জুড়ে অসংখ্য সাজানো এনকাউন্টার ও অপহরণের ঘটনা ঘটত এবং কেউ পাঞ্জাব পুলিশকে প্রশ্ন করার সাহস করতো না। বাবার অপহরণের পর পরিস্থিতি ঘুরে যায়। প্রথমবারের পাঞ্জাব পুলিশ প্রশ্নবিদ্ধ হয় আদালতে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে। তারা ভাবতে পারেনি শত শত অপহরণ ও

এনকাউন্টার হত্যার পর একটি লাশ এততা ভারী তাদের মাথার উপর চেপে বসবে। "

যশবন্ত সিং খালড়া এখনো বেঁচে আছেন। পাঞ্জাব জুড়ে।

পাঞ্জাবে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। নির্বাচনের পূর্বে শতলুজ রাজনৈতিক চর্চার অনেকটাই জুড়ে রয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি সহ পাঞ্জাবের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ৮০ দশক ও ৯০ দশকের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়নি। উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদীদের তুষ্ঠ করার প্রতিযোগিতা চলছে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে। এতে প্রকারান্তরে খালিস্তানি মতাদর্শ শক্তিশালী হচ্ছে। ৮০ ও ৯০ এর দশকে যারা

বিচার বহির্ভূত হত্যার স্বীকার হয়েছেন তারা বিচার পাননি। তাদের স্বজনদের ক্ষতে নিরাময়ের প্রলেপ এখনও পড়েনি। বহি:ভারতে খালিস্তানিরা এখনো সক্রিয়। পাঞ্জাবেও খালিস্তানিরা পুনরায় সক্রিয় হতে চেষ্টা করছে। এর বিরুদ্ধে জরুরী ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির দৃঢ় ভূমিকা। ধর্মকে রাজনীতি থেকে বিযুক্ত করা। পাঞ্জাবে উল্টোটাই ঘটছে এখন। এই পরিপ্রেক্ষিতে অতীতের মুখোমুখি হওয়া জরুরী অতীতের যেকোনো রূপে পুনরাবৃত্তি আটকানোর জন্য। যশবন্ত সিং খালড়ার জীবন ও কর্ম নিয়ে নির্মিত কাহিনী চিত্র এই প্রশ্নে ইতিবাচক অবদান রাখবে আশা করা যায়।

দুটি আদালতের দুটি রায় : কিছু কথা

- অলকানন্দা চৌধুরী

সাধারণ মানুষ আইন এবং আইনের অনুশাসন বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল সেটা আজও নির্দ্বিধায় বলা যায় না। তবে আইন এবং আদালতের নির্দেশ মেনে চলতেই তারা অভ্যস্ত। সেজন্য আদালতের সঠিক এবং আইন সম্মত রায় মানুষকে স্বস্তি দেয়। তাদের মনে আশা এবং ভরসা কে পাকাপোক্ত করে। একজন মানুষ হিসেবে তার নিজস্ব অধিকার এবং সেই অধিকার সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আদালতের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ভারতের সংবিধান তার নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য স্পষ্ট নির্দেশাবলী তৈরি করেছে। তার প্রয়োগ যথার্থ ক্ষেত্রে নাগরিকদের জন্য সঠিক পথের সন্ধান দেয়। সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও মর্যাদার অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।এর মধ্যে নিজের বাসস্থান, শিক্ষা এবং জীবনসঙ্গী নির্বাচনে স্বাধীনতার বিষয়টিও রয়েছে। এই অনুশাসন অনুযায়ী সাম্প্রতিককালে মুম্বাই হাইকোর্ট একটি মামলায় যে রায় দিয়েছেন তাতে ভারতের একটি প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সুরক্ষার বিষয়টি সুনিশ্চিত হয়েছে । এই রায় আরও অনেক স্বাধীনতাকামী এবং অধিকার সুরক্ষায় মনোযোগী নারীদের জন্য একটি মাইলস্টোন হয়ে রইল।

তেলেঙ্গানা রাজ্যের একটি ২১ বছর বয়সী তরুণীকে পালিয়ে মুম্বাই আসতে হয় কারণ তার পরিবার তাকে জোর করে নিজেদের মনোনীত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিল। তরুণী থেকে প্রায় ১০ বছর বড় এই পাত্রকে মেনে নিতে পারেনি বলে জানা থাকা সত্ত্বেও পরিবার নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে । অথচ তরুণী চেয়েছিল উচ্চশিক্ষা লাভ করে সে স্বনির্ভর হবে। রক্ষণশীল পরিবারের কাছে সেই ইচ্ছার কোন দাম ছিল না এবং কন্যার বিয়ে দেওয়া ছিল তাদের কাছে সবচেয়ে জরুরী এবং অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এরকম পরিস্থিতিতে মেয়েটি ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পরিবারের মানুষ মেয়েটিকে নিখোঁজ বলে স্থানীয় থানায় ডায়েরি করে। বুদ্ধিমতী তরুণী আঁচ করে, এই

ডাইরি সুবাদে হয়তোবা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য করবে আর তারপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হবে। সে আশঙ্কায় মেয়েটি মুম্বাই হাইকোর্টের নিকট তার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য আবেদন জানান। এ ক্ষেত্রে তার নিজের রাজ্য তেলেঙ্গানা এবং আশ্রয় নেওয়ার রাজ্য মহারাষ্ট্রের পুলিশ যেন তার নিরাপত্তা বিধান করে তার জন্য প্রার্থনা করা হয়। মুম্বাই হাইকোর্ট আবেদন কারিনীর সঙ্গে কথা বলে তার বক্তব্যকে ন্যায় সঙ্গত বলে ঘোষণা করেন। হাইকোর্ট স্পষ্টভাবে জানায় যে তরুণী নিজের ভবিষ্যৎ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কারণ সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদকে মান্যতা দিলে বলতে হয় প্রাপ্তবয়স্ক নারীর নিজের জীবন বেছে নেওয়ার অধিকার আইনগতভাবে স্বীকৃত। সেখানে জোর করে তাকে কোনোভাবেই বিয়ে দেওয়া যায় না। একই সঙ্গে হাইকোর্ট আরো নির্দেশ দেয় যে, মেয়েটির নামে যে নিখোঁজ মামলা করা হয়েছে তেলেঙ্গানা পুলিশকে সেটি বন্ধ করতে হবে । এই রায় প্রাপ্তবয়স্ক তরুণীকে নিজের স্বাধীন জীবন যাপনের ন্যায্য অধিকার দান করল এবং ভারতীয় সমাজ জীবনের একটি অনভিপ্রেত পরম্পরাকেও বেআইনি বলে প্রমাণ করল। আমাদের সমাজ এবং পরিবার মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ারই পক্ষপাতি । সেটা যে অন্যায় সেটাও এই রায়ে প্রতিফলিত।

এই রায় শিক্ষিত ও আধুনিক মানুষকে স্বস্তি দিয়েছে তাতে কোন দ্বিমত নেই। অথচ অপর একটি রায়, যা গুজরাট আদালত থেকে ঘোষিত হয়েছে, তা অনভিপ্রেত এবং মানুষকে বিস্মিত করেছে। কৌশল সোনার নামে এক ব্যক্তি আদালতে অভিযোগ জানান, একজন মহিলা হঠাৎ করে একটি সার্টিফিকেট এনে নিজেকে কৌশলের স্ত্রী বলে দাবি করেছেন যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তারা কখনো একসাথে থাকেনি এবং তাদের বিয়ে হয়নি বলে কৌশল সোনার জানিয়েছিলেন। এদিকে অভিযুক্ত মহিলা বলেছেন হিন্দু রীতি অনুসারে সাত পাক ঘুরে তাদের বিয়ে হয়নি। এই স্বীকারোক্তির উল্লেখ করে গুজরাট হাইকোর্ট বলেছে "সপ্তপদী" অর্থাৎ সাত পাক ঘুরে বিয়ে না হলে সেটা আইন সম্মত নয় কারণ বিয়ের মত পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানে "সপ্তপদী" বাদ দেওয়া চলে না । আদালত আরো জানিয়েছেন -- হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী বিবাহ শুধু একটি সামাজিক সম্পর্ক নয় বরং মানুষের

আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের পথ। উচ্চ আদালতের মতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান যা বিবাহ ক্ষেত্রে পালিত হয় তার মূল উদ্দেশ্য মানুষের আধ্যাত্মিক সত্ত্বার শুদ্ধি ও বিকাশ নিশ্চিত করা।

আদালতের এই রায় প্রকৃত সমাজ মনস্ক ব্যক্তির কাছে অদ্ভুত, বিবেচনা হীন এবং আধুনিকতার পরিপন্থী বলে মনে হয়েছে । মানুষ বিবাহকে দুটি হৃদয়ের পারস্পরিক মিলনের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবন কাটানোর ছাড়পত্র বলেই জানে। এমনকি প্রাপ্তবয়স্ক দুটি নর-নারী হামেশাই রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করে ও দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে। সেখানে ধর্মীয় রীতি নীতি আচার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ গৌণ । এই রায়ের পর সেই সব বিবাহকে কি অবৈধ বলে ধরা হবে। দুটি তরুন তরুণী আকাশের উন্মুক্ত আশ্রয়ে পরস্পর হাত ধরে তাদের প্রিয় কবির কবিতা উচ্চারণ করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এমনও শোনা যায়। এখানে মানুষের নিজস্ব মতামত ও নির্বাচনের স্বাধীনতার গুরুত্ব পেয়েছে । সেটা কখনোই বেআইনি নয়। অথচ আদালতের এই রায় শাস্ত্র আচার বিধি নিয়মকেই প্রাধান্য দিতে বাধ্য করবে যা কখনোই আমাদের কাম্য হতে পারে না। আইনের উপর ধর্মকে জরুরি করে তোলার এই প্রয়াস সর্বাংশে প্রতিবাদযোগ্য। এরমধ্যে দেশের আইন কে হিন্দুত্বের ধ্বজাধারি করে তোলার সুক্ষ প্রচেষ্টা সুপ্ত রয়েছে বলেই মনে হয়। ভারতের সংবিধান কিন্তু এই সংকীর্ণতার পথ দেখায়নি । তাহলে আদালতের এই রায়ের উৎস কি? আমরা কি তন্ত্র মন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতার বেড়াজালে আবার আবদ্ধ হব? সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদেরই।

BAAGHER BAACHCHAS UNITE!
hum kyu accountability le?
Hum to sirf credit lete hai

BAAGHER BAACHCHAS UNITE!
modih
DISSENT

BAAGHER BAACHCHAS UNITE!

INDEPENDENT STUDENTS
FOR RIGHT TO EDUCATION
OUR DEMANDS
RESIGNATION OF DHARMENDRA PRADHAN.
ACCESSIBLE EDUCATION FOR ALL.
JOB SECURITY FOR ALL.
STRUCTURAL REFORMS TO END EDUCATION CORRUPTION.
WE ARE IN SOLIDARITY WITH SONAM WANGCHUK
WE CONDEMN HIS DETAINMENT AND THE ATTACK ON STUDENTS.
EDUCATION FOR ALL. JUSTICE FOR ALL.
STUDENTS UNITE. EDUCATION IS OUR RIGHT!
ARE PRADHAN HULKU RE
TU RESIGN KAR NA RE
BASS KA KAM NHI HE
TERI WAJAH SE KITNE
NE SUICIDE KIYA HE RE !!!

ভয়ের মধ্যেও যারা সাহসী ছিল

.......তীর্থরাজ ধর

"দাদা, এখানে দাঁড়িও না। ওই যে আমার স্কুলের বাস।" ছেলেটি আঙুল তুলে দেখাল দূরে ট্র্যাফিকের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসা একটা হলুদ গাড়ির দিকে, "ওরা আমাকে এখানে দেখলে শুধু ঝামেলাই হবে।"

ছেলেটির বয়স সতেরো, একাদশ শ্রেণীতে পড়ে, শহরের একটি নামকরা স্কুলে। এটা ছিল টানা তৃতীয় দিন যে সে স্কুল কামাই করেছে। এর মূল্যও তাকে চোকাতে হয়েছে — শিক্ষকদের হেনস্থা, অনলাইনে হুমকি, তাকে তাড়া করে বেড়ানো ট্রোলিং — আর সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এমন আবহাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকা যা সপ্তাহভর কোনো করুণা দেখায়নি। বৃষ্টি থামেনি, আর পূর্বাভাসও সদয় কিছু বলছিল না।

বুধবার, ২২ জুলাই। সে একা ছিল না। সেই দুপুরে, বৃষ্টি সত্ত্বেও, বহু ছাত্রছাত্রী জড়ো হয়েছিল আগরতলা সার্কিট হাউসের কাছে — গান্ধী মূর্তি ব্যারিকেডের ভেতর থেকে দৃশ্যমান। দড়ি আর লোহার বেড়ার মাঝে চেপে দাঁড়িয়েছিল তারা, জেনেই যে হাত-ছোঁয়া দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে গোটা এক ডজন সশস্ত্র বাহিনী — টিয়ার গ্যাসের বন্দুক, লাঠি, দাঙ্গা-নিরোধক সরঞ্জাম, রাষ্ট্রের প্রস্তুতির সম্পূর্ণ ব্যাকরণ। কিন্তু ছেলেমেয়েরা ছিল উচ্চকণ্ঠ। তাদের আওয়াজ তীক্ষ্ণ, বয়স যে গম্ভীর স্বর একদিন দেবে তা এখনো আসেনি — কিন্তু উচ্চকণ্ঠ। কেউ যদি সেই পুরনো কথাটার প্রমাণ চাইত, যে সাহস কেবল ভয়ের উপস্থিতিতেই সম্ভব, সেদিনের সার্কিট হাউসই তার প্রমাণ হতে পারত। বিকেল নামার আগেই বৃষ্টি তাদের বেশিরভাগ কাগজের পোস্টার ছিঁড়ে দিয়েছিল। তারা সেটা সহজভাবেই মেনে নিয়েছিল।

"কাল আবার আসার আগে আমরা এগুলো ল্যামিনেট করিয়ে নেব। তখন বৃষ্টি কী করবে?"

এবং তারা আবার জড়ো হলো। তার পরের দিনও, এবং আবার তার পরের দিনও, যতদিন না তাদের প্রধান দাবি পূরণ হলো। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্ধত মনোভাব, তার সংবেদনহীনতা, জবাবদিহিতার অভাব — এসব তারা সহজভাবে মেনে নেয়নি। নিট-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল। তাদের একুশজন ভাইবোন এই কারণে আত্মহত্যা করেছিল। ছাত্ররা একে ডাকত যা তারা বিশ্বাস করত — প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা। শিক্ষামন্ত্রী দায় স্বীকার করেননি। শেষ পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রীকেই তাঁর চেয়ার ছাড়তে হলো।

তারা তাদের সহযোদ্ধাদের ডেকেছিল, আর সেই ডাক সাড়া পেয়েছিল। রাষ্ট্রের বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা ঋণ থাকে, আর এবারেরটা জুলাইয়ের অনেক আগে থেকেই বহু মানুষকে ক্ষুব্ধ করে রেখেছিল। ভিড়ের মধ্যে আমার এক স্কুলের অনুজের সঙ্গে দেখা হলো — দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে, সেই বছরগুলোর, যখন গেরুয়া-পরা সশস্ত্র লোকেরা ক্যাম্পাসে ঢুকে ছাত্রদের পিটিয়েছিল আর রাষ্ট্র হয় চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, নয়তো চেয়ে দেখেছিল। আমরা কথা বললাম সেই বছরগুলোর, সি.এ.এ ও এন.আর.সি-র, সেই শীতের, দিল্লির, আর ব্যাঙ্গালোরে জারি হওয়া বেআইনি কার্ফুর, যখন প্রকাশ্য দিবালোকে, আমার নিজের চোখের সামনে এবং আরও অনেকের চোখের সামনে, রামচন্দ্র গুহকে পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা কথা বললাম দূরের শহরগুলোর, দূরের বন্ধুদের — আর সেসব বলতে বলতেই আমরা বুঝে গেলাম, না বলেই, আমাদের ওপর এখন কী দায়িত্ব এসে পড়েছে।

আমরা যারা আর কখনও ক্লাসঘরের ভেতরে ফিরব না, তাদের এখন একটা কাজ ছিল। নিশ্চিত করা যেন কাউকে অকারণে আটক বা গ্রেপ্তার করা না হয়। নিশ্চিত করা যেন এই আন্দোলনে সহিংসতার ব্যবসায়ীরা ঢুকে না পড়ে। নিশ্চিত করা যেন বাচ্চাদের খাবারের অভাব না হয়। আর যদি আর কিছু না-ও করা যায়, তবু সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের দেখিয়ে দেওয়া — বিশেষ কোনো আড়ম্বর ছাড়াই বলা, আমরা তোমাদের সাথে আছি।

আমরা কার্যত একটা দীর্ঘস্থায়ী অবরোধের জন্য প্রস্তুত হলাম — আর অবরোধের নিজস্ব রসদ লাগে। খাবার, জোগান, বৃষ্টি থেকে আশ্রয়। এমন আইনজীবী যারা প্রয়োজনে দ্রুত আদালতে যেতে পারবেন। ডাক্তার যারা তৈরি থাকবেন। একজন মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, যদি কচি কাঁধে এই চাপ একা বহন করা কঠিন হয়ে পড়ে। ছাত্ররা যে সাহায্যের ডাক নিজেরাই দিয়েছিল, আমরা সেটাকেই আরও ছড়িয়ে দিলাম, আর পরের কয়েক দিনে বেশ কিছু আইনজীবী, সমাজকর্মী, ডাক্তার আর মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এসে তাদের পাশে দাঁড়ালেন।

এগুলো সেই ধরনের আন্দোলন ছিল না যা আমরা দেখে অভ্যস্ত। এই প্রজন্ম নিজেদের মতো করে কাজ করে। তাদের পোস্টার ছিল উদ্ভাবনী, তাদের স্লোগান ছিল আকর্ষণীয়, আর — এটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত সংবাদমাধ্যমকেও — একটা দৃশ্যমান, প্রায়-নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষোভের নিচে, তারা ছিল ভদ্র। সতর্ক, যেন তাদের দেখা যায় শুধু সঠিক কারণেই দাঁড়িয়ে আছে বলে, আর কিছু নয়। কোনো প্রশ্নই তাদের কাছে বড় ছিল না। নতুন শিক্ষানীতি, পদত্যাগের পরে কী হবে, সরকারে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার সম্ভাব্য পথ — এসবের মধ্য দিয়ে তারা এমন সাবলীলতায় এগিয়ে গেছে যা একই সাথে অকল্পনীয় আর মুগ্ধকর। তাদের অনেকেই ক্যামেরার সামনে কথা বলার সময় এমন দক্ষতায় নিজেদের উপস্থাপন করেছে যে মনে হতে পারে, আধা-রসিকতা করে বলাই যায়, জন্ম থেকেই যেন তারা মিডিয়া-প্রশিক্ষিত।

প্রথম তিন দিন — ২০ থেকে ২২ জুলাই — কোনো মূলধারার সংবাদমাধ্যম তাদের নিয়ে একটি শব্দও লেখেনি। আমার মনে হয় না তারা তা প্রত্যাশাও করেছিল। তারা আগে থেকেই জানত, যে মূলধারার সংবাদমাধ্যম গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই দেশের ভিন্নমতাবলম্বীদের ব্যর্থ করেছে, আর তাদেরও করবে। তাই তারা নিজেরাই নিজেদের চ্যানেল তৈরি করে নিল। টেলিভিশন যা করেনি, ইনস্টাগ্রাম তা করল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পেজ তৈরি হয়ে গেল। রিল বানানো, সম্পাদনা করা, আপলোড করা হলো — পেশাদার মানের সম্পাদনা, মুহূর্তটা ঘটার কয়েক মিনিটের

মধ্যেই সম্পূর্ণ — আর কিছু কিছু ভিডিও লক্ষ লক্ষ ভিউ পেরিয়ে গেল। এ এক এমন প্রজন্ম যাদের মূলধারার সংবাদমাধ্যমের প্রতি কোনো আস্থা নেই, আর সত্যি অর্থে তার প্রয়োজনও নেই তাদের; এই উদাসীনতা কোনো ভান নয়, নিছক এক নির্ভুল হিসাব।

এর মূল্যও ছিল। সেই দিনগুলোয় আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বেশ কয়েকজন ছাত্রীর — কেউ কেউ নাবালিকা — যারা সাইবারবুলিং নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিল: বিকৃত করা ছবি, তাদের মুখ জুড়ে দেওয়া অশ্লীল ছবিতে, আর সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া, এমন হুমকি যা সুস্পষ্ট, "সরকারের বিরুদ্ধে গেলে তার জরিমানা দিতে হবে।" আমরা সাইবার অভিযোগ দায়েরের কথা ভেবেছিলাম। কোনো সহজ সমাধান ছিল না। তাদের বেশ কয়েকজন নাবালিকা, সামনে পরীক্ষা, বাবা-মাকে জড়াতে অনিচ্ছুক — কারও কারও ক্ষেত্রে তো বাবা-মা জানতেনই না যে তাদের সন্তান সার্কিট হাউসে আছে।

তারপর দ্বিতীয় সমস্যাটা এলো যখন অবশেষে ক্যামেরা এসে পৌঁছাল: অনেক ছাত্রছাত্রীই চায়নি তাদের মুখ সম্প্রচারিত হোক। তাদের সমাধানও নিজস্ব এক উদ্ভাবন — বাঘের মুখোশ, হাতের কাছে তৈরি রাখা, ক্যামেরা ঘুরলেই বা ফোন উঠলেই মুখে পরে নেওয়া, স্লোগান শুরুর ঠিক আগে। যে বাচ্চারা ইতিমধ্যেই কঠিন উপায়ে শিখে গিয়েছিল একটা ক্যামেরাবন্দি মুখ কী হয়ে উঠতে পারে, তারা নিজেদের জন্য তৈরি করে নিয়েছিল এক ছোট্ট অজ্ঞাতনামা থাকার কৌশল — একই সাথে সংবাদমাধ্যম আর রাষ্ট্র, দুয়ের থেকেই লুকিয়ে।

আর তবুও তারা এমন শৃঙ্খলা নিয়ে অবস্থান ধরে রেখেছিল যা তাদের বয়সকে ছাড়িয়ে যায়। জেনেই যে গতি পাওয়া একটা আন্দোলন অন্য কারও দখলে চলে যাওয়ার ঝুঁকিতেও থাকে, তারা সাহায্য নিয়েছিল খুশি মনেই — ইউনিয়ন থেকে, অন্য গোষ্ঠী থেকে, আমাদের থেকে — কিন্তু শর্তে ছিল স্পষ্ট। ভারতের জাতীয় পতাকা ছাড়া আর কোনো পতাকা নয়। এমন কিছু নয় যা দিয়ে রাষ্ট্র এই আন্দোলনকে কোনো দলের কারসাজি বলে উড়িয়ে দিতে পারে।

২৫ জুলাই, রোদ আর বৃষ্টি দুই-ই একসাথে থাকা সেই দিনে, ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করলেন। কয়েক ঘণ্টা আগে পর্যন্তও ছাত্রছাত্রীদের কোনো ধারণাই ছিল না যে এটা আসছে। খবরটা যখন এলো, প্রথম কয়েক মুহূর্তের অবিশ্বাসের পর গোটা জায়গাটা ভেসে গেল আনন্দে — গান, নাচ, উৎসব — এমন এক উচ্ছ্বাস যা ছিল ছাত্রছাত্রীদের, আর তার নিজস্ব শান্ত সুরে, তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদেরও। বছরের পর বছর আমরা চেষ্টা করেছি, ব্যর্থ হয়েছি, এই সরকারকে কোনো কিছুর জন্য জবাবদিহি করাতে। এই ছেলেমেয়েদের জন্য, যাদের অনেকেরই এটা প্রথম রাজনৈতিক অবস্থান, এটা ছিল প্রমাণ যে রাস্তার কণ্ঠস্বর এখনও সেই চেয়ার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে যার দিকে তা ছোঁড়া হয়েছিল — যতদূর মনে করা যায়, গত বারো বছরে এই প্রথম এমন প্রমাণ।

কিন্তু আনন্দের চেয়েও যা আমাকে বেশি নাড়া দিয়েছিল তা হলো, সেই আনন্দকে একা দাঁড়াতে দেওয়া হলো কত অল্প সময়ের জন্য। এই ছাত্রছাত্রীরা এক বিরল স্বচ্ছতা নিয়ে বুঝেছিল, যেই স্পষ্টতা বিজয় খুব কমই দেয়, যে একটা পদত্যাগ — প্রতীকীভাবে যত ভারীই হোক না কেন — নিজে থেকে খুব কমই কিছু বদলাবে। উদযাপনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেখানকার আলোচনা ঘুরে গিয়েছিল: তাদের আসল দাবিগুলো কি সত্যিই পূরণ হয়েছে? একজন মন্ত্রীর চেয়ারের বাইরে জবাবদিহিতা বলতে কী বোঝায়? এই দেশের শিক্ষার বৃহত্তর কাঠামোর প্রতি কী আস্থা থাকা উচিত? সেখানে কেউই সেই মুহূর্তটাকে কোনো কিছুর সমাপ্তি বলে ভুল করেনি।

পরের দিন, রবিবার, ২৬ তারিখ, তারা একুশজন হারানো বন্ধুদের স্মরণ না করে আন্দোলন শেষ করতে রাজি হয়নি। সন্ধ্যায় তারা প্রস্তাবনা (প্রিয়াম্বল) পাঠের আসর বসাল, তারপর মোমবাতি হাতে শোকযাত্রা — সেই একুশজন ভাইবোনের জন্য। এভাবেই শেষ হলো — সার্কিট হাউসে ২০ থেকে ২৬ জুলাই।

এই লেখাটা লিখতে লিখতে, আমি আর কিছুর চেয়ে বেশি এই আশাই করি যে সেই বাস স্টপের সতেরো বছরের ছেলেটি তার ক্লাসঘরে ফিরে গেছে, আর জীবন, যতটা সম্ভব, তার আর তার মতো আরও অনেকের জন্য স্বাভাবিক আকারে

ফিরে এসেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ শহরের বাইরে থেকে এসেছিল, দিনের পর দিন বন্ধুদের বাড়িতে থেকেছে, বাবা-মায়ের অজান্তেই। এটা আমাদের সবার — যারা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, আর যারা দাঁড়াইনি — সকলেরই ভাবনার বিষয় হওয়া উচিত, যে এই সন্তানদের চোকানো মূল্য যেন এত ভারী না হয়ে ওঠে যে তাদের জীবন আর কখনো তার আগের আকারে ফিরতে না পারে।

চলে যাওয়ার আগে তারা আমাদের বলেছিল, এই বিজয়, যত মিষ্টিই হোক না কেন, তাদের প্রথম পদক্ষেপ মাত্র — আর যখন প্রয়োজন হবে, তাদের সাহস কোথাও যাবে না। এরাই সেই তরুণ কমরেড যারা এই দেশের একশো বছরের সংগ্রামের ধারা বহন করে চলেছে। যদি এমন কোনো কারণ থাকে বিশ্বাস করার যে ভবিষ্যৎ আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে কম অন্ধকার হতে পারে, তবে তা দাঁড়িয়ে আছে সার্কিট হাউসের বৃষ্টির মধ্যে, একটা বাঘের মুখোশ পরে, বাড়ি ফিরতে অস্বীকার করে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের স্বাস্থ্য কাঠামো অস্বাস্থ্যকর

- রতন দেবনাথ

স্বাস্থ্য দপ্তরের স্বাস্থ্য কাঠামো অস্বাস্থ্যকর, এই কথা বলার কারণ হচ্ছে আমি যদি সমাজের একজন চিকিৎসক হই তবে আমাকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে আমি ফিট হতে হবে। তবেই আমি জনগণকে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা দিতে পারব। তেমনি রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের হাল হকিকত যদি আমরা লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাই স্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলিতে ডাক্তার, নার্স, বিভিন্ন টেকনিক্যাল স্টাফ এবং গ্রুপ-ডি স্টাফ যে সংখ্যায় থাকার কথা সেই সংখ্যায় নেই। রাজ্যে বেকার ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য টেকনিক্যাল স্টাফ থাকা সত্ত্বেও রাজ্যবাসীর স্বার্থে নিয়োগ করছে না রাজ্য সরকার। আর যে সকল স্বাস্থ্যকর্মীরা রয়েছে তাদের মধ্যে ডাক্তার, নার্স ও বিভিন্ন টেকনিক্যাল কর্মীরা রেগুলার স্কেলে বেতন পেলেও সিংহভাগ গ্রুপ ডি কর্মী দীর্ঘ বছর ধরে অনিয়মিত অবস্থায় রয়েছেন। এই অনিয়মিত কর্মীদের মধ্যে রয়েছে ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার, ডিআরডব্লিও, ডিআরবি এবং স্লিপ ওয়ার্কার। রাজ্যে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে (১৯৯৩ সনের পর থেকে) স্বাস্থ্য দপ্তরে গ্রুপ ডি কর্মী স্বল্পতার কারণে, বিভিন্ন সময়ে প্রথায় অনিয়মিত কর্মী নিয়োগ করেছে। প্রাথমিক অবস্থায় তা অর্থ দপ্তরের অনুমোদন ছিল না। পরবর্তী সময় অর্থাৎ ২০১০ সন থেকে সেই সকল কর্মীদের অর্থ দপ্তরের অনুমোদন দেওয়ার প্রক্রিয়া চালু হয়। তাও দীর্ঘ আন্দোলন করার পর। যাই হোক সেই সকল অসহায় কর্মীরা এর থেকে একটা স্বপ্ন দেখতে শুরু করছিল ভবিষ্যতে তাদের চাকরি পাকা হবে বা রেগুলার হবে। কারণ, তৎ সময়ে রাজ্যে অনিয়মিত কর্মীদের জন্য একটা স্কিম ছিল, দশ বছর অনিয়মিত চাকরি পূরণ করার পর রেগুলার হবে। অনিয়মিতদের সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল ২০১৮ নির্বাচনের পর। ক্ষমতার পালাবদল হয়ে রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারা ক্ষমতায় বসার চার মাসের মধ্যেই

অনিয়মিতদের নিয়মিতকরণের সেই নীতি প্রত্যাহার করে। অথচ এই বিজেপি দলই ২০১৮ সনের নির্বাচনের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং ভিশন ডকুমেন্টের মাধ্যমে প্রচার করেছিল তারা ক্ষমতায় আসতে পারলে ছয় মাসের মধ্যে রাজ্যের সকল অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিত করে নেবে । কিন্তু, আমরা সকলে দেখলাম উল্টো, ছয় মাসের পূর্বেই অনিয়মিতদের নিয়মিত করন স্কিম বন্ধ করে দিয়েছে রাজ্যের বিজেপি সরকার । আজ ৮ বছর পূর্ণ হয়ে গেলেও বিকল্প কোন স্কিম তৈরি করতে পারেনি রাজ্য সরকার । ফলে এই আট বছরের মধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরে প্রায় এক থেকে দুইশ অনিয়মিত কর্মচারী বয়সের ভারে অবসরে চলে গেছে বা কেউ চাকরিরত অবস্থায় মারা গিয়েছেন । তারা কেউই কোনো আর্থিক সহায়তা পায়নি, যেহেতু চাকরি নিয়মিত না । অনিয়মিত কর্মীরা জীবন ও যৌবন স্বাস্থ্য দপ্তরে বিলিয়ে দিয়েও এক টুকরো স্বপ্ন দেখতেন বাড়ি ফেরার সময়ে রেগুলার হয়ে হাসিমুখে বাড়ি ফিরবেন । কিন্তু, বাস্তবে তা পূর্ণ হচ্ছে না । অমানবিক ও জনবিরোধী বিজেপি সরকার তা সমর্থন করে না, গত আট বৎসরে বুঝতে পেরেছে রাজ্যবাসী। স্বাস্থ্য দপ্তরের অনিয়মিত কর্মীদের রেগুলার বা নিয়মিত করনের জন্য অনিয়মিত কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে যাচ্ছে, সেই আন্দোলনে ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চও শামিল । সরকার যতই কঠোর মনের হোক না কেন, গণআন্দোলনের মাধ্যমে অনিয়মিত কর্মীদের অধিকার পূরণ হবে, ইতিহাসই সাক্ষী ।

২০১৮ সনে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরে প্রায় ১২শ বিভিন্ন স্তরের অনিয়মিত কর্মচারী ছিল, তা কমতে কমতে এখন প্রায় হাজারের কম । প্রায় ২০০ অনিয়মিত কর্মচারী খালি হাতে চোখের জল মুছতে, মুছতে অবসরে চলে গিয়েছে । শেষ সময়ও তাদের জন্য সরকারের পাথর হৃদয় গলে না । অথচ রাজ্য সরকারের একটা দলীয় স্লোগান আছে রাজ্যবাসীকে আপ্লুত করার জন্য, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস । আসলে পুরোটাই যে জুমলাবাজি আর বলার অপেক্ষা থাকে না । যাক, শুরুর প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি,

স্বাস্থ্য দপ্তরের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সুস্থ না । উদাহরণ হিসাবে বলছি আমাদের শরীরে ছোট-বড় অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, গুরুত্ব কম বা বেশি হলেও একটি অঙ্গ যদি কমজুরি থাকে তবে আমরা পরিপূর্ণ সুস্থ থাকতে পারিনা । তেমনি স্বাস্থ্য দপ্তরের বিরাট অংশে নিয়মিত কর্মী থাকলেও বিশাল অংশের অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিতকরণের ব্যবস্থা না থাকায় অনিয়মিত কর্মচারীরা শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ না ফলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যে প্রদান হবে না তা আর বলার অপেক্ষা থাকে না ।

৩১শে জুলাই, অনিয়মিত কর্মীদের কালো দিবস পালন

৩১শে জুলাই, রাজ্যে ৪০ হাজার অনিয়মিত কর্মীদের জন্য একটি কালো দিবস। ২০১৮ সনের ৩১ শে জুলাই, রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিতকরণের স্কীম বাতিল করে। একই সাথে আংশিক সময়ের কর্মীদের দশ বছর মেয়াদ পূর্ণ হলে অনিয়মিত কর্মী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের সার্কুলার বাতিল করা হয়। কৃষি শ্রমিকদের নির্দিষ্ট মেয়াদ অর্থাৎ ১৫ বছর বাদে ফার্ম ওয়ার্কার হিসেবে নিয়মিতকরনের সার্কুলার বাতিল করা হয়। ২০০৮- ২০০৯ থেকে অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিতকরনের স্কিম চালু ছিল। একই সাথে আংশিক সময়ের কর্মীদের ১০ বছর মেয়াদ পূর্ণ হলে অনিয়মিত

কর্মী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের আদেশ নামা ছিল। ২০১৮ সনের বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে প্রদত্ত গালভরা প্রতিশ্রুতির খেলাফ করে ৩১ শে জুলাই, ২০১৮ কালো সার্কুলার ও বিজ্ঞপ্তি জারি করে ৪০ হাজার অনিয়মিত কর্মী ও আংশিক সময়ের কর্মীদের প্রতি চরম অন্যায় করে রাজ্য সরকার। যদিও স্কিম বাতিলের বিজ্ঞপ্তি ও সার্কুলারে বলা হয়েছিল, স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রকল্প প্রণয়নের স্বার্থে বিদ্যমান স্কিম ও সার্কুলারগুলি বাতিল করা হচ্ছে। কিন্তু বিগত সাত বছরে নতুন স্কিম আনা হয়নি। স্কিম বাতিল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরিপন্থী। স্কিম বাতিল করে রাজ্য সরকার অনিমিত কর্মীদের নিয়মিতকরণের ক্ষেত্রে সমস্ত রকম দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন। ৪০ হাজার অনিয়মিত কর্মী ও আংশিক সময়ের কর্মীদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদার প্রতি চূড়ান্ত অন্যায় করেছেন।

রাজ্য সরকার নিয়মিতকরণের স্কিম বাতিল করে অনিমিতকর্মীদের নিয়মিত করন থেকে বঞ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। তাই ৩১শে জুলাই সারা রাজ্যে কালো দিবস পালন করেছেন অনিয়মিত কর্মীরা। বিভিন্ন দপ্তরে কালো ব্যাজ ধারণ করে অনিয়মিত কর্মীরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন, বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। দাবী করেছেন স্কিম বাতিল সংক্রান্ত সমস্ত বিজ্ঞপ্তি ও সার্কুলার সমূহ অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। সমস্ত ধরনের অনিয়মিত কর্মীদের অবিলম্বে নিয়মিত করতে হবে, নিয়মিত করন সাপেক্ষে সমকাজে সমবেতন দিতে হবে, আংশিক সময়ের কর্মীদের পূর্ণ সময়ের অনিয়মিত কর্মীর মর্যাদা দিতে হবে।

ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক রতন দেবনাথ জানিয়েছেন, কালো দিবস পালন কর্মসূচি সফল হয়েছে। আগামীদিনে অধিকার আদায়ের প্রশ্নে আইনী লড়াই ও আন্দোলন তীব্র হবে বলে জানিয়েছেন রতন দেবনাথ।

মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের চিতা আন্দোলন

-ঃমিহিরলাল রায়ঃ-

মধ্যপ্রদেশের ছাতারপুর জেলার বারোনা নদী। নদী বক্ষে চিতা সাজিয়ে আদিবাসীদের প্রতীকি 'চিতা আন্দোলন'। মহিলাদেরই অগ্রণী ভূমিকা। কারোর গলায় প্রতীকি ফাঁস, কেউবা মুখে মাটি মেখে নদী পাড়ে বসে রয়েছেন। কারো শরীর ঢাকা সাদা কাপড়ে, কিংবা কেউ প্রতীকি ক্রুশবিদ্ধ। কেউবা কোমর জলে দাঁড়িয়ে। তাদের ভাষায়- 'জল সত্যাগ্রহ'। দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন 'গণচিতার' আয়োজন। না, তারা কেউ এখানে মৃত্যুকে উদযাপন করতে সমবেত হননি। এসেছিলেন নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিতে। নিজেদের জল- জমিন- জঙ্গল বাঁচাবার ঘোষণা দিতে। সাথে এলাকার পরিবেশ – প্রতিবেশকে বাঁচাতে। কিন্তু সহ্য হয়নি রাষ্ট্রের। ১৯ জুন, জোর করে আন্দোলনরত নারী, পুরুষকে সরিয়ে দেয় পুলিশ। সূর্যের আলো ফোটার আগেই বীরপুঙ্গব পুলিশের দল বল প্রয়োগ করে। লাঠি চালায়। অবশ্য ছেঁদো যুক্তিও খাড়া করে পুলিশ। নদীর জল বাড়ছে, অবস্থানরত গোন্ড ও কোন গোষ্ঠীর আদিবাসীদের জীবন বাঁচাতেই নাকি তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কেন সামিল হয়েছিল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকেরা এমনতর আন্দোলনে ? দেশের প্রথম 'কেন-বেতোয়া নদী সংযোগ প্রকল্প" ঘিরেই ছিল এই আন্দোলন। ২০২৪ - এর ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর খাজুরাহোতে ৮৪,৬০৫/- কোটি টাকার নদী সংযোগ প্রকল্পটি সূচনা করেন। এই প্রকল্পেই বারোনা নদীর বুকে গড়ে উঠছে বাঁধ। সংশ্লিষ্ট আদিবাসীদের শঙ্কা, এতে উচ্ছেদ হতে হবে তাদের। কারণ বহু গ্রাম, চাষের জমি জলের তলে হারিয়ে যাবে। এলাকার বাস্তুতন্ত্র ছারখার হবে। যে পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের কথা বলছে সরকার তা শুধু অপ্রতুলই নয়, আছে জুয়োচুরিও। নিজেদের জল- জমিন- জঙ্গল হারাবার

যন্ত্রণাকে, ঘর ছাড়ার শঙ্কাকে ব্যক্ত করতেই, চলমান উন্নয়নের পরিহাসকে ধিক্কার জানাতেই ছিল তাদের এই অভিনব আন্দোলন।

এটাই তাদের এ নিয়ে প্রথম আন্দোলন তা কিন্তু নয়। গত এপ্রিল-মে মাসেও আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন তারা । মে মাসের ৮ তারিখ প্রতিবাদ পদযাত্রাও করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের টনক নড়াতে দিল্লির পথেও যেতে চেয়েছিলেন । দমন পীড়ণ এবং আটকে দেওয়ার কারণে যেতে পারেননি। তবে আন্দোলন থেকে সরে যান নি তারা । বাধ্য হয়ে প্রশাসন উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিলে, তাতে ভরসা করে অবশ্য আন্দোলন স্থগিত করে দিলেন । কিন্তু প্রশাসন প্রতিশ্রুতির খেলাফ করলে, আবার তাদের ফিরতে হয়েছে আন্দোলনেই । বারোনা নদীর তীরে, সেতুর নিচে গনঅবস্থানে প্রতিবাদের রকম ভাষা বদলালেও দাবিটা বদলায়নি জমির বদলে জমি চাই । গ্রামের বদলে গ্রাম । ক্ষতিপূরণের আর্থিক অংকটা বাড়াতে হবে। কিন্তু অনড় প্রশাসন। অথচ উচ্ছেদ শুরু করে দিয়েছে । আগাম নোটিশ ছাড়াই ভেঙেছে তিন শতাধিক বাড়ি। চরম গরমের মধ্যেই বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করা, ঘর ভাঙ্গার দানবীয় কাজ চলছে।

মেইন-স্ট্রিম মিডিয়াতে এসব আন্দোলনের খবর আজকাল তেমন আর আসে না। ফলত সোশ্যাল মিডিয়াই ভরসা। তার দৌলতেই আমরা জানতে পেরেছি আন্দোলনরত ওইসব আদিবাসীদের উপর শাসকের দমন পীড়ণের কথা। ওদের গ্রামের চারপাশের রাস্তা আটকে কার্যত গ্রামেই বন্দী করে রাখা হয়েছে। ক্ষোভ-বিক্ষোভের সরব হওয়ায় একের পর এক মিথ্যা মামলায় নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। জামিনে ছাড়া পেলে আবারো নতুন মামলা হয়েছে আড়াইশরও বেশি । ৮ ই মে এর প্রতিবাদ- পদযাত্রার দিনেই তাদের নেতা অমিত ভাটনগর কে গ্রেফতার করা হয়। কোন আইনে গ্রেফতার? বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের ধারায়। অথচ তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এমন আন্দোলনের, যা প্রতিবাদ জানাচ্ছে সরকারের তেমন কাজকর্মের যা বন্যপ্রাণী

সংরক্ষণের ক্ষতি করবে । শুধু তাই নয়, গোটা এলাকার বাস্তুতন্ত্রকে ছারখার করবে। সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতিকে বিপন্ন করবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই আন্দোলনকে বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলের দীর্ঘদিনের জলসঙ্কট দূর করার একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ হিসেবে তুলে ধরছে । সরকারের দাবি, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকার জমিতে সেচের সুযোগ বাড়বে। বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ পানীয় জলের সুবিধা পাবে । খরাপ্রবণ অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতিতে নতুন গতি আসবে। বিশেষজ্ঞরা, যারা সরকারের আজ্ঞাবহ নন, বলছেন প্রকল্পের গোড়ার যুক্তিটাই ভুঁয়ো। 'কেন' আর 'বেতোয়া' নদী এলাকার বৃষ্টিপাতের প্যাটার্ন প্রায় একই এক সঙ্গে খরা, একসঙ্গে বন্যা । তাহলে একটি নদী থেকে উদ্‌বৃত্ত জল আরেক নদীতে যাবে এই দাবিটাই ধোঁপে টেকেনা। আসলে যা হচ্ছে, তা কর্পোরেট স্বার্থে । জনস্বার্থের কোনো ছিটেফোঁটাও নেই। অন্যদিকে এর ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার জলবায়ু-আবহাওয়া-বাস্তুতন্ত্রের ব্যাপক ক্ষতি হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে ছাড়পত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে পরিবেশ মূল্যায়ন কি সঠিকভাবে হয়েছে ? নিন্দুকেরা বলেন, রাজ অভিলাষেই চোখ বুজে সই করেছেন দায়িত্বপ্রাপ্তরা । পরিবেশ ছাড়পত্রের প্রতিটি ধাপে বিশেষজ্ঞদের আপত্তি উপেক্ষা করা হয়েছে । অনেক আগেই সুপ্রিম কোর্টের নিজস্ব কমিটি যেসব প্রশ্ন তুলেছিল সেগুলোও উপেক্ষিত হয়েছে । প্রায় ২০ লক্ষ গাছ প্রকল্পের জন্য কাটা পড়বে। সরকারি হিসেবেই বলেছে ১৭ হাজারেরও বেশি গাছ কাটার তালিকাতে আছে । ইতিমধ্যেই পান্না টাইগার রিজার্ভের ভেতর ১২ হাজারেরও বেশি গাছ কাটা হয়েছে। অনুমান করা যাচ্ছে ওই রিজার্ভের ১০% ভূমিই জলে ডুববে। ফাজোন মিলিয়ে ৯ হাজার হেক্টর জমি জলের তলায় হারিয়ে যাবে। আদিবাসীদের শঙ্কা সব মিলিয়ে ২২ টি গ্রামের মানুষকে উচ্ছেদ করা হবে। ওই ২২টি গ্রামের মধ্যে ১০ টি গ্রাম জলে বিলীন হবে। সরকারি হিসেবই বলছে উচ্ছেদ হবে ৭১০০ টি পরিবার। আন্দোলনকারীরা বলছে সংখ্যা ১০০০০ ছাড়াবে।

যারা এই সময়ে দেশজুড়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের উপর তাদের জীবন জীবিকার উপর যে আক্রমণ নেমে এসেছে তার খবরা খবর রাখেন তারা বলছেন, কর্পোরেট ও রাষ্ট্রের চেনা জোট বেপরোয়া ভাবেই এখন জাতীয় স্বার্থের নামে কেড়ে নিচ্ছে আদিবাসীদের জল, জমিন আর জঙ্গল। মধ্যপ্রদেশের ছাতারপুর জেলার গোন্ড ও কোন গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও এটাই ঘটছে, 'কেন বেতোয়া নদী সংযোগ প্রকল্প' ঘিরে । সংশ্লিষ্ট আদিবাসীরা বলছেন, এই প্রকল্প শুধু যে তাদের বসতভিটাই কেড়ে নেবে, জীবন জীবিকা কেড়ে নেবে তাই নয়, তাদের পূর্বপুরুষের স্মৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকেও বিনষ্ট করবে। তাই তাদের কাছে এটা কেবল জমি হারানোর প্রশ্ন নয়, অস্তিত্ব হারানোরও প্রশ্ন । তাদের ভাষায়, " জল- জমিন-জঙ্গল হারালে আমাদের কাছে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না ।" তাই প্রতীকি গণচিতার আয়োজন, আর ক্ষণে ক্ষণে সজোর উচ্চারণ "ন্যায় দো, ইয়া মার দো"।

বিচারাধীন বন্দীর মৃত্যু : বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানালো টি এইচ আর ও

কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দি প্রণব কুমার পালের মৃত্যুর বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছে ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন (টিএইচআরও)। প্রশাসনিক তদন্তে কখনও প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় না। বলে অভিযোগ করেছেন টিএইচআরও সম্পাদক পুরুষোত্তম রায় বর্মণ। পাশাপাশি মৃতের অসুস্থতার সরকারি বয়ান নিয়েও গভীর সংশয় প্রকাশ করেছে টিএইচআরও। বিচারাধন বন্দির সংবিধান প্রদত্ত জীবনের অধিকার কোনোভাবেই লঙঘন করা যায় না। তাই কোন পরিস্থিতিতে বিচারাধীন বন্দি প্রণব কুমার পালের মৃত্যু তা নির্ধারণ করার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত জরুরি। তদন্ত সাপেক্ষে মৃতের পরিবারকে অন্তর্বর্তী ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদানের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি করেছে টিএইচআরও।

ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন, দুর্গা চৌমুহনী বিপনিবিতান, কর্তৃক থেকে প্রকাশিত

সম্পাদক পুরুষোত্তম রায় বর্মন